যাওয়া-আসা

বুদ্ধদেব গুহ

ডি এম লাইব্রেরী
কলকাতা

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৩৬৮

প্রকাশক
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি এম লাইব্রেরী
৪২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

মুদ্রাকর
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯

যাওয়া-আসা

কমলা সবুজকে একটা প্ল্যাস্টিকের ওয়াড্রোব কিনে দিয়েছিল। এটা যে কমলাই কিনে দিয়েছিল এ-কথাটা সবুজ সাহস করে হাসিকে বলতে পারেনি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ও ঠেকে শিখেছে যে, নিজের ভালোর জন্যে, সংসারের শান্তির জন্যে কিছু কিছু মিথ্যা কথা বলা ভালো। মানে, শুধু ভালোই নয়; তা না বললে, সমূহ বিপদ।

আজ অফিস থেকে ফিরে, নোনা-ধরা দেওয়ালে ঝুলতে-থাকা ওয়াড্রোবটা খুলে, তা থেকে হ্যাঙার বের করে হাওয়াইন্ শার্টটা যত্ন করে তুলে রাখল ও। প্যাণ্টটাও।

এই প্ল্যাস্টিকের হ্যাঙারগুলোও ওয়াড্রোবটার সঙ্গেই কিনে দিয়েছিল কমলা।

বাইরে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ হয়েছে। সারাদিন বড় ভ্যাপসা গুমোট গরম গেছে। বাড়ির আলসের ওপর, কাঁচের জানালায়, গলির ও-পাশের তেলেভাজার দোকানের টিনের ছাদের ওপর বৃষ্টির টিপটিপানি আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। গরম পিচের পথে প্রথম বৃষ্টি পড়ায় একটা মিষ্টি গন্ধ বেরুচ্ছে।

সবুজ তার জামা-প্যাণ্ট খুলে, উদ্‌লা-গায়ে শুধু আণ্ডারওয়্যার পরে, ঘরের বাতি নিভিয়ে অনেকক্ষণ জানালার ধারে দাঁড়িয়ে রইল। এই সময়টুকুতে তার অফিসের, তার একঘেয়ে জীবনের, তার সংসারের সমস্ত রকম দাবি থেকে ও নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং বিচ্ছিন্ন করে ও একেবারে নিজের, একেবারে একারই হয়ে গিয়ে ওদের বাসার সামনের বৃষ্টি-ভেজা গলিটুকুর দিকে তাকিয়ে থাকে।

হাসি হঠাৎ এসে ঘরে ঢুকল। অনুযোগের গলায় ওকে বলল,

চান করে নাও না। কী-যে সারাদিন পর বাড়ি ফিরে এসে অন্ধকার ঘরে বসে থাকো, বুঝতে পারি না। বলেই সবুজের উত্তরের অপেক্ষা না করেই আবার যেমনভাবে এসেছিল, তেমনভাবেই ফিরে গেল রান্নাঘরের দিকে।

তবুও সবুজ তেমনভাবেই দাঁড়িয়ে থাকল, আরো অনেকক্ষণ। তারপর একসময় লুঙ্গি-গামছা কাঁধে নিয়ে বাথরুমের দিকে গেল।

খোকা ক্লাস থ্রি-তে উঠেছে। পড়াশোনায় ভালো হয়নি ও। সবুজ ভালো ছিল। হাসিও ছিল। হাসি মুরলীধর গার্লস কলেজ থেকে স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষায় ফাবস্ট্-ডিভিশনে পাস করেছিল। হাসি নিজেই খোকার দেখাশোনা করে। খোকাটা বড় মা-ন্যাওটা। সব সময় হাসির গায়ে গায়ে থাকে—সবুজকে ভয় পায়। খুব একটা কাছেই আসে না। ঐসময় হাসির সামনে রান্নাঘরের বারান্দায় বসে খোকা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে স্কুলের পড়া করছিল।

হাসি এক্ষুনি মুসুরীর ডালে কাঁচালংকা-কালোজিরে সমবার দিল। তার মিষ্টি ঝাঁঝ রান্নাঘর ছাপিয়ে বাথরুমে এসে সবুজের নাকে লাগল। সবুজ ঝুপ্-ঝাপ করে মগ-মগ জল ঢেলে চান করল। তারপর আবার ঘরে এসে হাতল-ভাঙ্গা ইজিচেয়ারটায় বসে গলির দিকে চেয়ে থাকল।

প্রত্যেক দিন, এই সময়টা, সপ্তাহের পাঁচদিন শুধু এই সময়টাতেই ও একেবারে একা থাকে। এই সময়টাতে মনের মধ্যে অনেক-অনেক কথা আসে; যায়। তার মনে অনেকানেক বোধ কাজ করে তখন।

পাশের বাড়ির ট্রানজিস্টারে সরকারী পরিকল্পনার সাফল্যের কথা গাঁক-গাঁক করে সস্তা রেডিওতে ঠিকরোয়। কানে লাগে। ভালো লাগে না সবুজের। অন্ধকার ঘরে বসে সবুজ বাইরের স্বল্পালোকিত পথের প্রবহমান জনস্রোতের দিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে তাকিয়ে থাকে।

অল্পবয়সী চাকর রাম অন্ধকারেই ইজিচেয়ারের হাতলের উপর চায়ের কাপটা ঠকাস করে নামিয়ে রেখে যায়। আগে-আগে হাসি এইসময় চায়ের সঙ্গে একটু কিছু খাবার করে দিত। দুটো নিমকি কি অন্য কিছু। এখন যা বাজার পড়েছে! এর জন্যে সবুজের কিছু বলার নেই। ওর আয় আরো বেশী হলে হয়তো এতটা কষ্ট পেতে হতো না।

চায়ে চুমুক দিয়েই কিন্তু সবুজের মুখটা বিস্বাদ হয়ে যায়। বিরক্তিতে মন ভরে যায়। চা-টা যে শুধু ঠাণ্ডা, তাই-ই নয়, চিনি এত বেশী যে খাওয়াই যায় না। রোজ রোজ সবুজ বলেছে যে, ওর চায়ে কম চিনি দিতে—কিন্তু সে-কথা মনে থাকে না হাসির। হাসির কিছুই মনে থাকে না—সবুজের কেমন মনে হয় যে, আজকাল হাসি ইচ্ছে করেই ওর সঙ্গে এমন ব্যবহার করে। ওদের দু'জনের মধ্যের সম্পর্কটা যেন কেমন হয়ে গেছে। কতদিন যে সবুজ হাসিকে আদর করে না, তা ভালো করে মনেও পড়ে না ওর। ও-ব্যাপারে হাসির ইচ্ছে-অনিচ্ছের কথা শুধোবার মত ঔৎসুক্যও যেন অবশিষ্ট নেই সবুজের। বেঁচে থেকেও ও'যেন কেমন মরে গেছে।

হাসি যখন সব কাজ সেরে ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে প্রতিদিন রাতে, তখন হাসির সারা শরীর দিয়ে ঘামের গন্ধ বেরোয়। হাসির ঘামের গন্ধটা সবুজের ভালো লাগে না। সবুজ দূরে সরে শুয়ে থাকে।

পাখাটা ঝুল পড়ে কালো হয়ে গেছে। ওটা কটকট আওয়াজ করে ঘোরে—একটা নীল বৈদ্যুতিক আভা সমানে ঝিলিক মারে পাখার ভিতর থেকে। গলির ল্যাম্পপোস্টটার আলো তালি-দেওয়া মশারির উপর এসে পড়ে। সবুজের ক্লান্তিভরা চোখের সামনে তখন কমলার হাসি-হাসি মুখটা ভেসে ওঠে। নিজের ঘরে, নিজের স্ত্রীর পাশে শুয়ে, ঘামের গন্ধের মধ্যে,

অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে, তার সমস্ত অসহায়তার মধ্যে, দূরের—বহু দূরের এক সুন্দর শব্দ-স্পর্শ-গন্ধের উচ্ছল কল্পনায় বিভোর হয়ে সবুজ ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে থাকে। যতক্ষণ না তাদের গলি কোলকাতা বিভিন্ন লোকের গলা-খাঁকারির শব্দে, রিকশা ঠুনঠুনে, বাচ্চার কান্নায় আবার জেগে ওঠে।

২

অফিসে পৌঁছতে সেদিন দেরি হয়ে গিয়েছিল। সরকারী অফিস। এখানে কাজের ক্লান্তির চেয়ে অফিস যাওয়া-আসার ক্লান্তি, অফিসে বসে-থাকার ক্লান্তিটাই ওকে বেশী করে পীড়িত করে। অফিসে ঢোকার পর প্রথম প্রথম কাজ করতে চেয়েছিল ও—চেয়েছিল নিজের কাছে নিজে সৎ থাকবে। ভেবেছিল, সরকার বেশী টাকা মাইনে না দিলেও যা টাকা দেন তার বদলেও ওর কিছুটা কাজ করা উচিত। ওর বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে অনেকেই বে-সরকারী অফিসে কাজ করে। ও জানে, তাদের কতখানি খাটতে হয়; যদিও তাদের কাছে একথা ও স্বীকার করে না। তবু সেইসব অনভিজ্ঞ দিনে ও কাজকে ভালোবাসত, অফিস যে কাজ করারই জায়গা, এটা যে আড্ডাখানা নয়, বন্ধু-বান্ধবের দেখাশোনার বা বসবার ঘর নয়, এ-কথা ও স্বীকার করতে চাইত না। কিন্তু আজ করে।

কাজ করতে গিয়ে দেখেছে যে, ওদের সেক্‌শানে ওকে একাই সব কাজ করতে হয়, অন্যরা কিছুই করে না। তদুপরি "গুড বয়", "তেল-দেওয়া কর্মচারী", "ক্যারিয়্যারিস্ট" এ-সব কথাও সহকর্মীদের কাছ থেকে শুনতে হয়। এখন ওর বিবেক বলে কোনো পদার্থ নেই। প্রতিদিন যে বহু-সংখ্যক লোক তাদের সরকারী অফিসে নানারকম উমেদারী ও তদ্বির করতে আসে, কোনো কাজ, কিছু কাজই যে উমেদারী ছাড়া হয় না এখানে, এটাকে এখন আর লজ্জাকর বলে মনে হয় না ওর। পাবলিক সার্ভেন্ট নয় ওরা। পাবলিকই এখন ওদের সার্ভেন্ট—এই স্বাধীন ভারতবর্ষে এ-কথাটা চাপে পড়ে, দায়ে পড়ে, নিজের স্বার্থে, নিজেকে সহকর্মী-

দের সন্দেহ, ঘৃণা, রোষ থেকে বাঁচাবার জন্যে ও আজ মেনে নিয়েছে। মেনে নিয়ে দশজনের একজন হয়েছে ও।

সবুজ যখন পৌঁছল, তখনও দু'একজন ছাড়া কেউই আসেনি। পৌণে এগারোটা বাজে এখন। ও পাখার নীচে বসে ঘাম শুকুল। জল ভরে নিয়ে এল নিজের জন্য এক গ্লাস। তারপর ড্রয়ারটা খুলে, পেপারওয়েট, কলম-পেনসিল সব বের করে টেবলে রেখে, একটা সিগারেট ধরিয়ে, ওদের অফিসের বহুতলা বাড়ির জানালা দিয়ে ও-পাশের বহুতলা বাড়ির নীলরঙা পর্দা লাগা জানালাগুলোর দিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে চেয়ে রইল।

সিগারেটটা পুড়তে থাকল, পাখার হাওয়ায় লাফিয়ে লাফিয়ে সবুজ অনুভব করতে পারল যে ও-ও পুড়ে যাচ্ছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে নিজের মধ্যে, নিজের বুকের মধ্যে প্রতিদিন। ঘুষ-ঘাষ, অকর্মণ্যত অযোগ্যতা ও বিবেকহীনতার পরিবেশ এবং সর্বোপরি কিছু না-করার গ্লানিটা, করার মত কিছুই-না-করে দিনগুলো একে এ পুড়িয়ে ফেলার অসহায় বোধটা ওকে এক দুরারোগ্য ক্যান্সারে মত কুরে-কুরে খাচ্ছে। প্রতিটি মুহূর্ত।

সবুজ বড় একা। ওর খুব জানতে ইচ্ছে করে, ওর চারিদিকে অনেকানেক লোকের মধ্যে আর কেউ ওর মত একা আছে কি না মানে, সব থেকেও, ঘবে-বাইরে থাকার মত মোটামুটি সব কি থেকেও, প্রতিদিন বহুক্ষণ বহু লোকের দ্বারা পরিবেষ্টি থেকেও যারা একা থাকে, তেমন লোক আরো আছে কি না ওর খুব জানতে ইচ্ছা করে। ওর·মতই সেইসব লোকগুলো অফিস করে, সহকর্মীদের সঙ্গে আড্ডা মারে, চা-সিগারেট খায় ওপরওয়ালার শ্রাদ্ধ করে, লোককে হয়রান আর বিরক্ত করে কর দিনে দশটা-বিশটা টাকা উঁপরি কামায়। এরাও শনিবা সিনেমায় যায়। স্ত্রীর সঙ্গে শোয়, তাকে আদর করে, ছেলেমেয়ে চুমু খায়, এরা সমাজের এই বাঘ-বন্দীর ঘরে গুরুজন-

সবার প্রতি যথাযথ সাধ্যমত কর্তব্য করে। অথচ, এদের বুকের মধ্যেটা বড় ফাঁকা। এদের বুক খাঁ-খাঁ করে। কী দারুণ একা এরা। সবুজেরই মত।

এরা এ-সংসারে একজন-দু'জন ছাড়া কারো সঙ্গেই একাত্ম হতে পারে না। একাত্ম হওয়ার মত লোকের বড় অভাব এ-সংসারে। এ লোকগুলোর বড় কষ্ট। এদের কেউ বোঝে না। এরা নিজেদেরও বোঝে না নিজেরা। এরা সুখী করতে গিয়ে দুঃখ দেয় অন্যকে—নিজে সুখী হতে গিয়েও তা-ই। সবুজ ভাবে, ও একটা হতভাগা। এমনিই, একা একা নানারকম শব্দ, চিৎকার, চেঁচামেচির, মধ্যে বসে এসব কথা ভাবতে ভাবতে সবুজের চোখের কোণা জ্বালা করে ওঠে। সবুজ চশমাটা খুলে ফেলে একবার মুছে নেয়।

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সবুজ। এমন সময় মদন বেয়ারা এসে বলল, সবুজবাবু, সাহেব ডাকছে।

সবুজ চমকে উঠল। ওর ঘোর ভাঙ্গল। জুতোটা খুলে রেখে বসেছিল। ধীরে-সুস্থে কাবলী জুতোটা পায়ে গলিয়ে সবুজ সাহেবের ঘরেব দিকে এগিয়ে গিয়ে, দরজা খুলল।

সাহেব ডাইরেক্ট রিক্রুট অফিসার। একেবারে ছেলেমানুষ। চকরা-বকরা জামা পরে অফিসে আসে, জমিয়ে আড্ডা মারে, কাজ কিছু বোঝে না আপাতত; বোঝার চেষ্টাও করে না। কিন্তু লোক ভালো। কারো পেছনে লাগে না, হাকিমতা নেই একেবারে, 'লিভ অ্যাণ্ড লেট্ লিভ' দর্শনে বিশ্বাস করে। এখনও সৎ আছে। মনে হয় আরো বছর পাঁচেক সৎ থেকেও যাবে। যদি না…যদি না তাঁরও জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়।

সবুজ ঘরে ঢুকতেই সাহেব যেন হাতে চাঁদ পেলেন। বললেন, আরে আপনি এসে গেছেন! এক্ষুনি বড়সাহেব ডেকেছিলেন। দিল্লী থেকে টেলেক্স এসেছে সেই রিপোর্টটা সম্বন্ধে। আমাকে

বড় গালাগালি করলেন, বুঝলেন। ওটা কি এখনও তৈরী হয়নি?

সবুজ বুঝতে পারল না সাহেব কোন্ রিপোর্টটার কথা বলছেন। দিল্লীর সাহেবদের কাজই তো কথায় কথায় রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো—এই অকাজের কাজ করেই সকলের দিন যায়—তো কাজের কাজ করবে কখন?

মুখে বলল, কোন রিপোর্টটার কথা স্যার?

সাহেব ডান হাতের আঙুল নেড়ে, যেন তানপুরা ছাড়ছেন এমনভাবে বললেন, আরে সেই যে মোষের রিপোর্ট? যে-করে-হোক আজকে বেলা একটার মধ্যে রিপোর্টটা তৈরী করে দিন সবুজবাবু। মনে আছে তো? সেভেন্টি-ওয়ান, সেভেন্টি-টু-তে কোন্ কোন্ কনট্রাক্টরের মোষ ছিল। এবং ক'টা করে মোষ ছিল এবং আমার চার্জে সবসুদ্ধ কতগুলো মোষ ছিল।

—আচ্ছা স্যার। বলল সবুজ। তারপর ফিরে এল সেকশানে।

পুরো ব্যাপারটাই, এই সরকারী অফিসের কাজকর্ম ওর কাছে হাস্যকর বলে মনে হয়। পার্লামেণ্টে বোধহয় কেউ কোনো প্রশ্ন তুলে থাকবে কোনো কনট্রাক্টরের মোষ সম্বন্ধে। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে এত্তেলা পাঠানো হল ভারতবর্ষের আনাচে-কানাচে—কাঁড়া-বয়েলের হিসাব চেয়ে।

ঘরে ঢুকেই সবুজ দেখল হারাধন এসে গেছে।

সবুজ বলল, হারাধন! ভাই মোষের রিপোর্টটা এখনও দিলি না, ছাখ তো কি মুশকিল! আজই একটার মধ্যে দিতে হবে।

হারাধন পুলিনের সঙ্গে মনোযোগ সহকারে ডিম্পল্-কাপাদিয়ার নতুন ছবি নিয়ে আলোচনা করছিল।

হারাধন বলল, বোসো তো সবুজদা। বোসো। সকাল-সকাল দিলে মেজাজটা খারাপ করে। কোথায় ডিম্পল্, কোথায় মোষ!

সবুজ নার্ভাস হয়ে গিয়ে বলল, আরে ব্যাপারটার গুরুত্ব তুই বুঝছিস না। গালাগালি খেতে হবে যে।

হারাধন বলল, খুবই বুঝেছি। বড়সাহেব দিল্লী থেকে গালাগাল খেলে মেজসাহেবকে ডেকে গালাগাল করেন, মেজসাহেব ছোটসাহেবকে, ছোটসাহেব আপনাকে এবং আপনি এই সবেধন হারাধনকে। গালাগালি স্নেহের মতই নিম্নগামী। কাজ যতটুকু করার তা এই হারাধনকেই করতে হয়, ছড়ি ঘোরাবার বেলায় আপনারা, লাইন লাগানো সাহেবরা।

তারপর হারাধন একটু চুপ করে থেকে বলল, তুমি ঘাবড়িও না। এক্ষুনি এলাম। এক কাপ চা খাই। তারপর তোমার রিপোর্ট তোমার সামনে বসেই করে দিচ্ছি।

সবুজ নিজের জায়গায় গিয়েই বসল।

ভাবতে লাগল, হারাধন একটা ফাইলও দেখেনি আজ পর্যন্ত। ইনডেক্স রেজিস্টারে সমস্ত ফাইলের হিসাব আছে। দেখে দেখে তৈরী করতে হবে রিপোর্টটা। কি করে যে করবে ও-ই জানে। ঠিক মত করতে হলে তিন-চার দিনের কাজ।

এমন সময় ফোনটা বাজল। সেকশানের ফোনটা সবুজের টেবিলেই থাকে।

ফোনটা তুলতেই ওপাশ থেকে কমলা বলল, তুমি ?

—হু ! বলল সবুজ।

কেন জানে না, কানে এতবার এত নারীর কণ্ঠস্বর বাজল, সবুজ এত গায়িকার গান শুনল জীবনে, তবু কমলার গলার স্বরের মত কিছুই এ পর্যন্ত ও শুনল না। কমলার রিন্‌রিনে গলার স্বরে ওর সমস্ত নরম মেয়েলী মিষ্টি স্বভাব যেন গলে গলে পড়ে। মস্তিষ্কের মধ্যে সে স্বর যেন সমস্ত অন্ধকার কোণগুলিকে আলোকিত করে তোলে। এত ভালো লাগে সবুজের ; এত ভালো লাগে। এই চারিদিকের ভালো-না-লাগার মধ্যে কমলা তার একমাত্র ভালো-লাগা ; চাপ-চাপ অন্ধকারে একমাত্র আলো।

কমলা বলল, এ্যাই ! আমাদের সঙ্গে এক জায়গায় যাবে ?

—কোথায় ?

—হাজারীবাগ।

—হঠাৎ ?—সবুজ শুধোল।

—হঠাৎ আবার কি ? তোমার-আমার জীবনে যা কিছু ঘটেছে সবই তো হঠাৎ।

তারপর একটু থেমে আবার বলল, কি, যাবে তো ?

—আর কে যাবে ?

—আর আবার কে ? আমি আর তুমি !

—ঈস্‌স্‌ বড় যে সাহস ! সবুজ বলল।

—সাহস আমার সব সময়েই আছে। তুমিই ভীতু।

তারপরই বলল, কুমুদও যাবে।

এমন সময় হারাধন চা খেয়ে এসে সবুজের টেবিলে বসল।

বলল, বের করুন আপনার রিপোর্ট।

সবুজ কমলাকে বলল, আমি একটু পরে তোমাকে ফোন করছি।

কমলা অবুঝ গলায় বলল, না। এখনই কথা বলো। শুধোল, তোমাদের ওখানে বৃষ্টি হচ্ছে ?

—এই শুরু হলো।

—আমাদের এখানে খুব বৃষ্টি হচ্ছে।

সবুজ আবার বলল, আমি এখন ছাড়ছি। পরে করব।

কমলা বলল, না। আমি ছাড়ব না। আমার এখন কথা বলতে ভীষণ ইচ্ছে করছে।

হারাধন সবুজের মুখের দিকে দু'চোখ স্থির রেখে তাকিয়ে ছিল।

সবুজ তাড়াতাড়ি বলল, ছাড়ছি কিন্তু এখন।

বলেই, কমলার উত্তরের অপেক্ষা না করেই রিসিভারটা নামিয়ে রাখল খট করে।

হারাধন হাসল। বলল, বাঃ সবুজদা। আপনি গুরুদেব

লোক। বেড়ে চালিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু।

সবুজ ধমকের গলায় বলল, কী ইয়ার্কি করছ?

হারাধন বলল, বাঃ, আমার ঘাড়ে রিপোর্ট চাপিয়ে নিজে দিব্যি মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলছেন।

সবুজ বলল, কি যে যা-তা বলো, আমার কাজিন।

হারাধন বলল, কেন ছাড়ছেন দাদা? আপনার চোখই বলছে কাজিন নয়। এতে লজ্জার কি? আপনার তো গর্ব হওয়ার কথা। পেরেম-ফেরেম কি সকলের কপালে জোটে? শোওয়া-শুয়ির ব্যাপার আলাদা—ওতে কোন বাহাদুরী নেই। কড়ি ফেললেই শোওয়া যায়।—কিন্তু পেরেম! একটা অন্য হাইটে পৌঁছে দেয় লোককে।

তারপর বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, কি? দেয় না? শালা তিরিশ বছর বয়স হতে চলল, একজন মেয়েও বলল না যে, আমাকে ভালোবাসে! কত চকোলেট খাওয়ালাম, কত আইসক্রীম। সিনেমা দেখিয়ে-দেখিয়ে ট্যাঁক গড়ের মাঠ হয়ে গেল—তবু শালা একটা সিরিয়াস-টাইপের মেয়ে দেখলাম না যার সঙ্গে প্রেম করা যায়। সব একেবারে জাত-চ্যাংড়া, জাত জকবাজ।

সবুজ ধরা পড়ে গিয়েছিল। ওর কানের লতি গরম হয়ে এল।

ও মুখ নীচু করে ড্রয়ার হাতড়ে রিপোর্টটা বের করল। ছাপানো দশ-এগারো পাতার রিপোর্ট। রিপোর্টটা টেবলে রাখল।

হারাধন বাঁ-হাতে সিগারেট ধরে, ডান-হাতে কলম নিয়ে পাতার পর পাতা খুলে প্রত্যেক কলামে 'নিল্' লিখে যেতে লাগল।

সবুজ হাঁ-হাঁ করে উঠল।

বলল, করো কি ? করো কি ? ফাইলগুলো একবার দেখলে না পর্যন্ত ?

হারাধন বলল, সব দেখা আছে। দেখলে কি আর রিপোর্ট অন্য কিছু হতো ? কোনো কোম্পানীর ব্যালান্স-শীটে মোষ থাকে দাদা ? দু'একজন ফরেস্ট কনট্রাকটর-ফনট্রাকটরের ফাইলে থাকলেও থাকতে পারে। থাকলেই বা কি ? কার কি ক্ষতিবৃদ্ধি হতো তাতে ?

দেখতে দেখতে পুরো রিপোর্টটা শূন্যে শূন্যে ভরে গেল। রিপোর্টটা ভরে দিয়ে হারাধন বলল, যান, এবার এখানকার মোষেদের দিয়ে সাইন করিয়ে দিল্লীর ধেড়ে-মোষেদের কাছে পাঠিয়ে দিন। বলেই ছন্দ করে আবৃত্তি করল ঃ

“ঝাঁপর ঝাঁই, থাঁপর থাঁই
কাঁড়া-ভহিস্, বয়েল গাই,
ঝাচা-মাচা, ঝাচা-মাচা ॥”

সবুজ চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বলল, এ আবাব কি ?

হারাধন নিজের টেবলে যেতে যেতে বলল, কাল পড়লাম ; তা-ই মনে আছে।

—কোথায় পড়লে ? সবুজ শুধোল।

—সুনির্মল বসু-র “জীবন-খাতার কয়েক-পাতাতে”। পড়েন নি ?

সবুজ বলল, না।

রিপোর্টটা নিয়ে সাহেবের ঘরে পৌছল সবুজ।

সাহেব একজন বন্ধুর সঙ্গে বসে কফি খেতে খেতে পার্লামেণ্টারী ডেমোক্রেসি ও ডিকটেটরশিপের মধ্যে কি তফাত তা নিয়ে সারগর্ভ আলোচনা করছিলেন।

আলোচনা থামিয়ে বললেন, বাঁচালেন সবুজবাবু। দিন। কোথায় সই করতে হবে, বলুন।

সবুজ ওকে বুঝিয়ে বলল, রাগ করো না—একটা মোষ-সংক্রান্ত রিপোর্ট নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম।

কমলা খিলখিল কবে হাসল। বলল, সত্যিই ?

সবুজ বলল, সত্যি।

—যাক্‌গে মোষেব কথা। তুমি যাবে তো ?

—কবে ? সবুজ শুধোল।

—আগামী বৃহস্পতিবাব। সেকেণ্ড স্যাটাবডেব ছুটি আছে শনিবাব। বৃহস্পতিবাব বেবোবো। শুক্র, শনি ও ববি থেকে ববিবাব বাতে আবাব বওযানা হয়ে সোমবার ফিরে আসব। কুমুদেব এক বন্ধুব বাড়ি আছে—ক্যানাবি হিল বোডে—মালী রান্নাবান্না কববে। খুব মজা হবে।

সবুজ বলল, ছুটি পাওনা নেই আমাব। দেখি, ক্যাজুয়াল লিভ নিতে পাবি কিনা শুক্রবাব।

—দেখি-টেখি না। যেতেই হবে। তুমি না গেলে আমি কিন্তু যাব না। আমাকে কালকেব মধ্যে জানাবে।

—বেশ।

—আব কি খবব বলো ?

—কোনো খবব নেই। তুমি কেমন আছ ?

—ভালো। সব সময়েই ভালো থাকি আমি। তুমি ?

—আমি সব সময়েই খাবাপ থাকি। জানো তো তুমি !

—জানিই তো ! তাই-ই তো আমার সঙ্গে ঘন ঘন দেখা হওয়া দরকাব।

—বুঝি, স্বীকারও করি। সবুজ বলল।

—কবো তাহলে ? জেনে ভালো লাগল।

তাবপরেই কমলা বলল, আজ অফিস থেকে কখন বেরোবে ,

—ঠিক নেই। সাহেব যখন বেরোবেন। সাহেব সাধারণত চারটের পর থাকেন না। চারটের আগে বেরোতে পারব না।

সবুজ দেখিয়ে দিল কোথায় সই করতে হবে।

সাহেব সই করে দিয়ে বললেন, বড়সাহেবের পি-এর কাছে এক্ষুনি দিয়ে আস্থন। ওঁরা দিল্লী পাঠাবার বন্দোবস্ত করবেন।

রিপোর্টটা নিয়ে যেতে-যেতে সবুজ ভাবছিল যে, এই শূন্যতায় ভরা রিপোর্ট আরো হাজার হাজার শূন্যতাভরা রিপোর্টের সঙ্গে মিশে দিল্লীর দরবারে যে কি মহাশূন্যতার সৃষ্টি করবে তা অনুমান করাও মুশকিল। সারা ভারতে হাজার-হাজার বড়-ছোট সরকারী কর্মচারীদের যে-পরিমাণ সময় ও যে-পরিমাণ কাগজ দিল্লীর কর্তারা এই মোষ-খোঁজার ব্যাপারে নষ্ট করালেন, তা এই বাজারে ক্ষমার অযোগ্য।

গতকাল খোকার স্কুলের কাজের জন্যে এক্সারসাইজ বুক কিনতে গিয়ে কাগজের দাম জেনেছে ও। শুনেছে, দেশে কাগজের অভাবে স্কুলের পাঠ্য-বই ছাপা হচ্ছে না।

পুরো ব্যাপারটাই সবুজের কাছে পয়েন্টলেস বলে মনে হচ্ছিল। তার অবসাদ, তার উৎপাদন-হীন-কর্মজনিত অবসন্নতা তাকে আরো বেশী করে পেয়ে বসেছিল। কিন্তু ওর করার কী আছে? ও একজন সামান্য আপার-ডিভিশন ক্লার্ক। মধ্যবিত্ত বাঙালীর জীবনের একমাত্র গন্তব্য যা—ও সেখানে পৌঁছেছে। এই দেশজোড়া সরকারী দক্ষযজ্ঞের মধ্যে ও একচিলতে কাঠ মাত্র। ওর কিছুই করার নেই এ ব্যাপারে।

ও ভাবল, তার চেয়ে ফিরে গিয়ে কমলাকে ফোন করলে অনেক ভালো লাগবে।

ফিরে গিয়ে নিজের টেবলে বসতে না বসতেই ফোনটা আবার বাজল।

ওপাশ থেকে কমলা বলল, কি? কাজ দেখাচ্ছিলে বুঝি? আমরা বুঝি আর কাজ করি না? যারা অফিস যায় তারাই শুধু কাজ করে?

তারপর শুধোল, কেন ?

—আজ আমাদের বাড়ি আসবে ? মাংসের সিঙাড়া খাওয়াব ? পুর করে ফেলেছি। বিকেলে তুমি এলে গরম গরম ভেজে দেবো।

—কুমুদ কখন বাড়ি ফিরবে ?

—কেন ? কুমুদ না থাকলে তুমি আসতে পারো না ? কার দাম তোমার কাছে বেশী ? আমার না কুমুদের ?

—তুমি জানো না ? সবুজ নরম করে বলল।

—জানি বলেই জানতাম। কিন্তু মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়। কুমুদ আজ দেরি করে ফিরবে। অফিসের পর ওর একটা পার্টি আছে। কি ? আসবে তো ?

সবুজ বলল, আসব।

বলে ফেলেই, ওর লজ্জা লাগল। কুমুদ না থাকলে যে ওর ভালো লাগে, অনেক বেশী ভালো লাগে, এ-কথাটা যে ওর গলার স্বরে ধরা পড়ে গেল, এই ব্যাপারটা ওর নিজের কাছে লজ্জাকর মনে হলো।

কমলা বলল, তাড়াতাড়ি আসবে কিন্তু।

সবুজ বলল, আচ্ছা !

ফোন ছেড়ে কিছুক্ষণ, অনেকক্ষণ সবুজ একটা ভালো লাগার ঘোরের মধ্যে ডুবে রইল। ওর চারপাশের সহকর্মীদের উচ্চস্বরের কথা, নানারকম আওয়াজ, গোলমাল, কোনো কিছুই ওর কানে আসছিল না। ওর কানের মধ্যে রেলগাড়ির চাকার আওয়াজ বাজছিল, নাকে আসছিল জঙ্গলের গন্ধ, আর বুকের মধ্যে একটা দারুণ চাপা ভালো-লাগার বোধ। বড় কষ্ট ; বড় কষ্ট সবুজের। চাপা-যন্ত্রণার মত চাপা-আনন্দের কষ্টও ভারী কষ্ট। টাকা-পয়সার টানাটানি, সংসারের অশান্তি, ছেলে-বউয়ের জোয়াল-টানা ক্লান্ত কেরানীর অনেক কষ্ট। কিন্তু—এই কমলাজনিত কষ্টের আনন্দ অথবা আনন্দের কষ্ট সবুজের একারই—তার একান্ত। এইখানে,

একমাত্র এই একফালি সবুজ জমিটুকুতে অন্য সমস্ত মোষেদের থেকে সে আলাদা—এইখানে শিং উঁচিয়ে—কান নাড়িয়ে সে পটাপট করে নরম কচি-কলাপাতা-সবুজ ঘাস ছিঁড়ে খেয়ে ও নিজের সুখে চরা-বরা করে।

এই ফুল-ফলন্ত-ফালিটুকু তার জীবনের একমাত্র পালিয়ে-থাকার জায়গা।

অফিস থেকে বেরোতে বেরোতেই প্রায় সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল। অবশ্য খাতায়-কলমে ওদের অফিস সাড়ে দশটা থেকে সাডে পাঁচটা অবধি রোজই—সপ্তাহে ছ'দিন। কিন্তু এগারোটার আগে কেউই বড় একটা আসে না। কেউ কেউ তো সাড়ে এগারোটায় আসে—আর বিকেলে সাড়ে চারটের পরই অফিস ফাঁকা হয়ে যায়।

আজ দেরি হয়ে গেল, কারণ সাহেব দেরি করে উঠলেন। সবুজ ওঁকে বলে একটু তাড়াতাড়ি যে চলে যেতে পারত না, তা নয়। কিন্তু চক্ষুলজ্জাতে বাধল। এখনও অন্য অনেকের মত ও চোখের চামড়া পুরোপুরি পোড়াতে পারেনি।

কমলাদের বাড়ির কাছাকাছি ও যখন বাস থেকে নামল, তখন অন্ধকার হয়ে গেছে প্রায়। পথের বাতি জ্বলে উঠেছে। বাস-স্টপ থেকে দু' ফার্লং মত হেঁটে গিয়ে কমলাদের একতলা বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে ও কলিং-বেল টিপল।

কমলা নিজেই এসে দরজা খুলল। দরজা খোলার আগে ভিতর থেকে বলল, কে?

সবুজ বলল, আমি।

কমলার বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে "আমি" বলে উত্তর দিতে ভারী ভালো লাগে সবুজের। সে যে আর কেউ নয়, সে যে সবুজ, এই দরজায় তার যে বিশেষ আমন্ত্রণ, তার বিশেষ সম্মান, এ-কথা তার নতুন করে মনে পড়ে যায়। এই জীবনে, এই জগতে প্রতি দিন, প্রতি রাত নিজের কাছে, নিজের ঘরে, ঘরের বাইরে সম্মান খোয়াতে খোয়াতে এসে এই একটি জায়গায় সে নিজের

সম্মানকে ফিরে পায়—নতুন করে এক অদ্ভুত ভালো-লাগার আশ্লেষে আবিষ্কার করে সবুজ ওর হারিয়ে-যাওয়া, নুয়ে-পড়া আমিকে।

কমলা দরজা খুলেই অনুযোগের সুরে বলল, এত দেরি করলে কেন? তুমি খুব খারাপ!

কমলা দরজাটা বন্ধ করে দিল।

সবুজ বলল, তোমার বাহন কোথায়?

কমলা হাসল। বলল, ওকে দোকানে পাঠিয়েছি।

সবুজ বাচ্চা ছেলের মত আবদার করল, তাহলে একবার এসো। এই! কাছে এসো।

কমলা বলল, কী যে করো না? ঘরের মধ্যে আলো জ্বালানো, পরদা উড়ছে হাওয়ায়—তুমি কি আমার ক্ষতি করতে চাও?

সবুজ বলল, তুমি নিজের বিন্দুমাত্র ক্ষতি স্বীকার না করেই লাভবান হতে চাও, এই-ই তো তোমার দোষ।

কমলা হাসল। বলল, আহা রে! কী আমার লাভ? আর লাভ যেন আমার একারই! অসভ্য!

—অসভ্যই তো! বলল সবুজ।

ওরা দু'জনে বসবার ঘর পেরিয়ে শোওয়ার ঘরে গেল। শোওয়ার ঘরে খাটের সামনে একটা সোফা পাতা। ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবেরা ওখানেই বসে গল্প-টল্প করে।

কমলা শোওয়ার ঘরে ঢুকতেই সবুজ ওকে বুকের মধ্যে নিয়ে আদর করল। কমলার ঠোঁট দুটো শুষে নিল নিজের ঠোঁটে—গাল ঘষতে লাগল ওর গালে—।

কমলা মেঘলা-দুপুরের কবুতরের মত অস্ফুটস্বরে কি সব বলতে লাগল বিড় বিড় করে—যে-সব শব্দের অর্থ হয় না কোনো—যে-সব শব্দ শুধু উষ্ণ নিঃশ্বাস, কোমল সী-গালের মসৃণ শরীরের মত পেলব কমলার বুকের দ্রুত-ওঠানামার পরিপূরক মাত্র। এইসব

সুদুর্লভ ক্ষণে কথা বলে না সবুজ—শুধু অনুভব করে, অনুরণিত হয়, সমস্ত অন্তরের সমস্ত তীব্রতার সঙ্গে।

সবুজ মনোহারী দোকানের শো-কেসের সামনে দাঁড়ানো অবুঝ বালকের মত একই সঙ্গে একই নিঃশ্বাসে সব কিছু পেতে চায়। ব্লাউজের মধ্যে দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ও কমলার সুগন্ধি পেলব স্তনে হাত ছোঁওয়াল, গাল ঘষতে লাগল।

কমলা শিউরে শিউরে উঠছিল। বলছিল, আর না। লক্ষ্মীটি, এখন আর না সবুজ।

সবুজ আলিঙ্গনাবদ্ধ কমলার শরীরের মধ্যে একটা কাঁপুনি অনুভব কবল—বুঝতে পারল, সেই কাঁপুনি ওর শরীরেও ছড়িয়ে যাচ্ছে।

কমলা আবার বলে উঠল, আর না গো, আর না।

সবুজ কমলাব দুই বাহুতে ওর দু'হাত রেখে ওর সামনে স্থির হয়ে দাঁড়াল, দাঁড়িয়েই, ওর দু'চোখে বার বার চুমু খেতে থাকল।

কমলা গাঢ় স্বরে বলল, আমার চোখে যে কি দেখেছ তুমি?

সবুজ বিড় বিড় কবে বলল, বুঝবে না।

তারপর আবারও বলল, তুমি বুঝবে না।

এমন সময় কলিং বেলটা বেজে উঠল।

কমলা শাড়ি ঠিক করতে করতে বলল, ঈস্‌স্, জংলী, তুমি একটা জংলী। আমার বুক জ্বালা করছে—কি শক্ত খোঁচা খোঁচা দাড়ি তোমার।

সবুজ একটু হাসল। অপরাধীর মত বলল, সেই সকালে কামিয়েছি তো! তারপরই বলল, তোমার লেগেছে সোনা?

কমলা ওর বলার ধরনে ও স্বরের আন্তরিকতায় হেসে ফেলল। বলল, হুঁ। লেগেছেই তো। ভীষণ লেগেছে। তারপর বাইরের ঘরের দিকে যেতে যেতে একবার তাকাল সবুজের দিকে।

সবুজ বুঝতে পারল, লাগাটাই ভালো-লাগা।

কী এক দারুণ প্রসন্নতায় সবুজের মন ভরে গেল। সবুজ ভদ্র-সভ্য হয়ে সোফাটায় বসে পড়ে খবরের কাগজটা হাতে তুলে নিল। যে-কাগজ সকালে আদ্যোপান্ত পড়েছে ও।

কমলার ঝি পারুল থলি নিয়ে ঘরে ঢুকল কমলার পিছনে পিছনে।

কমলা বলল, পারুল, সিঙাড়াগুলো এবার ভেজে তোল। চায়ের জল চাপিয়ে দে।

পারুল শুধোল, দাদাবাবুও কি এখুনি আসবে ?

কমলা অন্যমনস্কের মত বলল, আসবার তো কথা এখুনি। তবে সব ভাজিস না, দাদাবাবু এলে তখনই বরং গরম গরম ভেজে দিস দাদাবাবুর জন্যে।

সবুজ সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলে কমলার মুখের দিকে তাকাল।

পারুল চলে যেতে কমলা চোখ দিয়ে এক অদ্ভুত ইসারায় সবুজকে বুঝিয়ে দিল যে, পারুলকে ও মিথ্যা কথা বলেছে। কুমুদ এখন আসবে না।

তারপর কমলা হঠাৎই বলল, আমি এক্ষুনি আসছি, অ্যাঁ! তুমি বোসো। পারুল কি ঠিক করে ভাজতে পারবে, জানি না! একটু বোসো, কেমন ?

সবুজ একা ঘরে বসে ছিল। ঘরের চারিদিকে চেনা আসবাব—টুকিটাকি। বড় ডাবল-বেড খাটটা—পাট-পাট করে বিছানার উপরে ফিকে হলুদ বেড-কভার পাতা। আজ অবধি সবুজ কখনও এই খাটকে বেড-কভার তোলা অবস্থায় দেখেনি। ওর ভাবতেও কেমন গা শিউরে ওঠে। এই খাটে শুয়ে, বেড-কভারের নীচের দুগ্ধফেননিভ বেড-শীটে তার বিছানা-আলো-করা নরম নগ্নতায় কমলা শুয়ে থাকে—রোজ। হ্যাঁ! রোজ রোজ। আদর খায় কুমুদের।

আজ অবধি কখনও চরম আদর করেনি সবুজ কমলাকে।

কখনও সুযোগ হয়নি। ও এখনও জানে না, কমলা তা সত্যি-সত্যিই চায় কি না। মেয়েরা বড় অদ্ভুত। ওরা এই একটা ব্যাপারে অনেক বিবেচনা করে। অন্য ব্যাপারগুলো ব্যাপারই নয় বুঝি। কিন্তু সবুজের মাঝে মাঝে বড় ইচ্ছা করে, একদিন কমলার কমলারঙা সম্পূর্ণতায় তাকে সম্পূর্ণভাবে পায়।

এর আগে, অনেকদিন আগে, একদিন এ-প্রসঙ্গ তুলেও ছিল সবুজ, কিন্তু কমলা পিছিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, কুমুদ যে আমাকে বিশ্বাস করে সবুজ, ও যে আমার উপর বড় নির্ভর করে। আমাদের তো ছেলেপেলে নেই; হবেও না—যদিও দোষটা আমার নয়—তা-ই ও যেন আমার উপর অন্য যে-কোনো স্বামীর চেয়েও বেশী নির্ভরশীল। এটা থাক। বাকি থাক এটা। বড় খেলো হয়ে যাব আমি কুমুদের কাছে।

তারপর কি ভেবে, সবুজের নিভে-যাওয়া মুখের দিকে চেয়ে বলেছিল, যা দিই তোমাকে, যা দিতে পারি তা নিয়ে কি তুমি খুশী নও? এটা না-নিলেই কি তোমার নয়? তুমি একদিন ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে যে, নিছক এই দেওয়ার চেয়েও অনেক দামী দান তোমাকে দিয়েছি আমি। তুমি বুদ্ধিমান। তোমার বোঝা উচিত।

এতোতেও যখন সবুজ মুখ গোঁজ করে বসেছিল, তখন ওর কাছে উঠে এসে কমলা ওর চুল এলোমেলো করে দিয়ে বলেছিল, আমি তো বলিনি যে, কখনোই দেবো না। দেবো হয়তো কোনোদিন। কিন্তু এখানে নয়, এই কোলকাতায় নয়, এই ডিজেলের ধোঁয়ায়, এই আওয়াজে, এই বিয়ের-খাটে নয়—। অন্য কোনোখানে, বাইরে কোথাও, নির্জনে, যেখানে আমার নিজেকে চোর-চোর বলে মনে হবে না—যেখানে বাধা পাওয়ার ভয় থাকবে না—যেখানে ধীরে-সুস্থে, অবহেলায়, শিশিরের ফিস্‌ফিসানির মধ্যে, ঝিঁঝির ডাকের মধ্যে, বাইরের বন-প্রান্তরের বুকে ফুটফুট করা চাঁদের

আলোর মধ্যে তুমি আমাকে পেতে পারবে। আমি তো তোমারই। চিরদিনের তোমার। আমার ভালোবাসা কি শুধু এই প্রমাণটুকুর উপরই নির্ভরশীল? এই প্রমাণ ছাড়া কি একে অন্যভাবে কিছুতেই প্রমাণিত করা যায় না?

তারপরই নিজের মনে বলে উঠেছিল, তোমরা, পুরুষমানুষরা বড় বোকা সবুজ। দামী জিনিসটাকে সস্তা ভাব, আর খেলো জিনিসটাকে দামী!

জানে না, সবুজ জানে না, অন্য পুরুষমানুষের কথা জানে না, ও শুধু নিজের কথা জানে। সবুজের মনে কোথায় যেন কি একটা কাঁটার মত বেঁধে। কমলা আর তার সম্পর্কের মধ্যে এই না-পাওয়ার ঘটনাটা কেমন একটা ব্যবধান রচিত করে রাখে। সবুজ ভাবে, কমলা কেন বোঝে না যে, এটা তো একটা পাওয়া-মাত্র নয়, একটা শারীরিক পরিপ্লুতিই নয়; এ যে এক চরম মানসিক স্বীকৃতি। একজন পুরুষ ও নারীর মধ্যে জীবনে একবার, শুধু একবারের জন্যেও এ-সম্পর্ক স্থাপিত হলে বোঝা যায়, বিশ্বাস করা যায়, বিশ্বাস করতে ভালো লাগে যে, একের অদেয় কিছুই ছিল না অন্যকে। দু'জনে অন্তত একবারের জন্যে হলেও কোনো এক মুহূর্তের জন্যে মিলিত হলেও, জানা যায় জন্ম-জন্মান্তরের, চিরদিনের, প্রাগৈতিহাসিক সম্পর্কের সেই শিহর-তোলা সোনালী শীলমোহর পড়েছিল সেই সম্পর্কে। একদিন। কোনোদিন।

জানে না। সবুজ হয়তো বোকা। হয়তো সমস্ত পুরুষরাই বোকা। অথবা তাদের রুচি, তাদের বোধ, তাদের রোম্যান্টিকতা মেয়েদের তুলনায় অন্যরকম। সম্পর্কের গভীরতার ব্যাপারে পুরুষরা যতটা বিশ্বাস করে প্রমাণের উপর, মেয়েরা হয়তো ততটা করে না। কিন্তু কমলাকে কি করে জানাবে ও? কমলারা কমলা; সবুজরা সবুজ। হয়তো দু'জনেই ঠিক; অথবা ভুল। কিন্তু ভুল অথবা ঠিকের কোনোটাই একই কারণ-নির্ভর নয়।

কিছুক্ষণ পর কমলা এল, নিজে হাতে ট্রে নিয়ে। রেকাবীতে গরম সিঙাড়া, চিলি সস এবং জলের গ্লাস। ট্রে-টা নামিয়ে রেখেই কমলা বলল, নাও, খেয়ে নাও—গরম-গরম। খিদে 'পেয়েছে নিশ্চয়ই খুব।

সবুজ বলল, নাঃ। পেয়েছিল, এখন পেট ভরে গেছে।

কমলা অবাক হলো। বলল, সে আবার কি?

সবুজ বলল, একটু আগে খেলাম না!

কমলা বুঝল কথাটা, ওর মুখ আরক্ত হয়ে গেল, বলল, খালি ঐ সব, না? অসভ্য!

সবুজ বলল, তুমি? তুমি খাবে না?

কমলা বলল, হবে হবে, তুমি খাও তো আগে। তোমাকে সামনে বসে খাওয়াতে খুব ভালো লাগে আমার। কেন ভালো লাগে জানি না। কিন্তু বিশ্বাস করো, ভীষণ ভালো লাগে।

সবুজ চামচে করে সিঙাড়া ভেঙ্গে ভেঙ্গে মুখ নীচু করে খায়—খেতে খেতে একবার কমলার দিকে তাকায়—কমলার দিকে তাকিয়ে ওর মন কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে। কমলা ওকে কত আদর করে, কত কি খাওয়ায়, কত দেওয়ায় ভরে দেয় সবুজকে—অথচ সবুজ বদলে কিছুই করতে পারে না। তার আর্থিক সাচ্ছল্য নেই—অর্থ না থাকলে কি দিয়ে ও তার ভালোবাসা প্রকাশ করবে?—মেয়েরা একটু হাসি হেসে—এক চিলতে চিকণ চোখের চাউনিতে এত কিছু দিতে পারে, দেয়, অথচ পুরুষরা কি গরীব—প্রকৃতি তাদের নিঃস্ব করে রেখেছে। তাদের যা-কিছু সার্থকতা, যা কিছু দাম তা মেয়েদের মূল্যায়নের উপর নির্ভর করে। তারা দাম দিলে তবেই সবুজরা দামী হয়, দামী বলে প্রতিপন্ন হয় নিজের কাছে।

কমলা পারুলকে ডেকে বলল, চায়ের জলটা হয়ে গেলে আমাকে ডাকিস, আমি চা করব। সবুজবাবু এক চামচ চিনি খান, জানিস তো। থাক, তোর করতে হবে না—তুই ডাকিস।

ঘরের মধ্যে উজ্জ্বল আলো জ্বলছিল। সবুজ সোফায় বসেছিল, কমলা খাটের এক কোণায়। একটা ফলসা পাড়ের ফলসা-ডুরে-তোলা তাঁতের শাড়ি পরেছিল কমলা, সঙ্গে অফ-হোয়াইট স্লিভলেস ব্লাউজ। গলায় একটা মঙ্গলসূত্রম্।

কমলার মত চুল আজকাল দেখা যায় না মেয়েদেয়। খোলা অবস্থায় ওর চুল হাঁটু অবধি নেমে আসে। এলো-খোঁপা বেঁধেছিল কমলা। ওর হাঁসের মত নরম অথচ ঋজু গ্রীবায় সেই চুলের ভার নেমে এসেছিল। অবাক হয়ে, ভালো-লাগায় মরে গিয়ে সবুজ তাকিয়েছিল কমলার দিকে। আর চুপ করে খাচ্ছিল।

হঠাৎ সবুজ বলল, আমার ভারী অবাক লাগে। ভাবলে সত্যি অবাক লাগে।

—কি? শুধিয়েছিল কমলা।

—তোমার মত একজনের কি দেখে ভালো লেগেছিল আমার মত সাধারণ চেহারার, বিত্তহীন, গুণহীন লোককে। আমার মধ্যে কী যে দেখেছিলে তুমি, তা তুমিই জানো। মাঝে মাঝে মনে হয়, তুমি বুঝি খেলা করো আমাকে নিয়ে, আমাকে আসলে তুমি ভালোবাসো না, আমি তোমার পুতুল। যতদিন কাছে রাখো, কাছাকাছি থাকো, ততদিন ভয়ের কারণ দেখি না। কিন্তু যেদিন তোমার পুতুলখেলা শেষ হবে, যেদিন আমাকে তুমি দূরে ছুঁড়ে ফেলবে, সেদিনের কথা ভাবি। তোমার তো কত স্তাবক—তোমার রূপের, তোমার গুণের; কিন্তু আমার যে তুমি ছাড়া কেউ নেই। তুমি যে আমার কী, আমার কতখানি, আমার সমস্ত অস্তিত্বের জন্যে আমি যে কতখানি তোমার উপর নির্ভর করি তা কি তুমি কখনও বুঝেছ? জানি না। কিন্তু বড় ভয় করে আমার।

কমলা খিলখিল করে হাসল—ওর সুন্দর পরিচ্ছন্ন দাঁতগুলিতে আলো ঝিলিক মারল।

কমলা হাসল। বলল, তোমার কি আছে তুমি জানো না।

তুমি কি নিজেকে জানো? আমরা কেউই কি নিজেকে জানি? অন্যরা ছাড়া আমাদের নিজেদের তো কোনো অস্তিত্বই নেই—প্রয়োজনও হয়তো নেই। আমার চোখে তুমি যে কি তা তুমি কখনও জানবে না, আমিও হয়তো কোনোদিন জানব না যে, তোমার চোখে আমি কি। এটা না হয় অজানাই থাকল। যা জানা গেছে, যেটুকু জানা হয়েছে একে অন্যকে, তাই নিয়েই খুশী থাকি আমি, খুশী আছি। তুমি পারো না কেন? অনাগত ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে বর্তমানটাকে মাটি করে যারা, আমি তাদের দলে নই।

সবুজ বলল, তুমি কি সুন্দর গুছিয়ে কথা বলো! ইচ্ছে করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তোমার কথা শুনি! তোমার সামনে বসে। শুধু তুমি আর আমি।

কমলা হাসল। বলল, সকলের সঙ্গে পারি না। তুমি হয়তো কথা বলিয়ে নিতে জানো। কই? কুমুদের সঙ্গে তো হুঁ-হাঁ দিয়েই সারি। মনে হয় নতুন করে, সুন্দর করে বলার মত কোনো কথা নেই আর ওর সঙ্গে। একে অন্যকে বড় বেশী জানা হয়ে গেছে, বড় কাছ থেকে। কারো মধ্যেই আর অন্যকে চমকে দেবার মত নতুন কিছু, গোপন কিছু বুঝি অবশিষ্ট নেই। থাকলে ভালো হতো।

কিছুক্ষণ পর, কমলার নিজে হাতে বানানো দু'কাপ চা খেয়ে, গল্প করে একসময় উঠল সবুজ।

বলল, চলি! আটটা বাজে।

কমলা দরজা অবধি এল। পারুল ভিতরে ছিল। সবুজ কমলার ডানহাতখানি তুলে নিয়ে নিজের ঠোঁটে ছোঁওয়ালো। ছুঁইয়ে হাত নামিয়ে দিতেই কি এক অদৃষ্টপূর্ব আবেগে কমলা তার কাঁধের দু'পাশে দু'হাত জড়িয়ে ওর গলায় চুমু খেলো। ফিসফিস করে বলল, আবার এসো। কেমন? তুমি এলে খুব ভালো লাগে।

সবুজ নিজেই ছিটকিনিটা নামাল, নামিয়ে দরজার পাল্লা খুলল।

কমলা বলল, হাজারীবাগে যাচ্ছো তো? না গেলে ভালো হবে না কিন্তু।

সবুজ বলল, খুব চেষ্টা করব। আমার কি যেতে ইচ্ছে করে না? সত্যিই চেষ্টা করব।

পথে নেমে, মুখ নীচু করে সবুজ হাঁটতে লাগল। ওর মনে হলো যে ও হাঁটছে না, বুঝি ভেসে চলেছে। ওর মাথার মধ্যে কোনো অদৃশ্য সেতারীর সেতারে আনন্দের ধুন্ বাজতে লাগল।—, সরকারী কেরানী, গলির মধ্যের অন্ধকার ঘরে থাকা ছানা-পোনা নিয়ে দিন-আনা-দিন-খাওয়া সবুজ হঠাৎ বিড়লার চেয়েও বড়লোক হয়ে গেল, ইন্দিরা গান্ধীর চেয়েও বেশী প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠল। যদি কোনো ভিখারিনী সেই মুহূর্তে এসে তার কাছে কিছু চাইত, তাহলে ওর যা-কিছু আছে সব—সব—হাতঘড়ি, কলম, চিম্‌সে-পড়া চামড়ার মানিব্যাগের সব ক'টি টাকা ও দিয়ে দিত—একবারও না ভেবে।

পথটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানে এসে হঠাৎ পিছন ফিরে চাইল সবুজ, হঠাৎই, দেখতে পেল, খোলা-দরজায় দু'হাতে দুই কপাট ধরে কমলা একরাশ আলোর মধ্যে তার পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সবুজের বুকের মধ্যে কি যেন একটা উৎসারিত হয়ে উঠল। (আনন্দ সময় সময়-বড় কষ্টকর হয়।) ওর খুব ইচ্ছে হলো, এক দৌড়ে ফিরে যায় আবার ওর স্বর্গে, ফিরে গিয়ে কমলার কোলে মাথা রেখে একটু শোয়—ওর জীবনের—ওর জীবিকার, ওর সংসারের সব অসহায় ও অসহনীয় অপারগতার, হীনমন্যতার ক্লান্তি ও অপনোদন করে।

কিন্তু ও মোড়ে এসে বাঁক নিল।

পথের পাশে একটা ডাস্টবিন—তা থেকে উপচে পড়েছে নানা-

রকম পূতিগন্ধময় আবর্জনা। একটা কুকুর এবং দু'জন ভিখারী তার মধ্যে থেকে খুঁটে খুঁটে কি যেন খাচ্ছে।

সবুজও এমনি করেই খুটে খুঁটে খায়। খেয়েছে সারাজীবন—খেয়ে, বেঁচে থেকেছে, যা অন্যের উচ্ছিষ্ট, খেয়েছে অসম্মানের সঙ্গে—সেই উচ্চমন্য দয়ার দান।

এ ডাস্টবিন থেকে নয়, অন্য অনেক ডাস্টবিন থেকে, খেয়েছে অন্যরকম ডাস্টবিন থেকে। প্রতিদিন।

কিন্তু পরক্ষণেই ওর নাক ভরে গেল। আবর্জনার গন্ধে নয়, চান-করে-ওঠা কমলার গায়ের সাবানের গন্ধে, ওর পাট-ভাঙ্গা তাঁতের শাড়ির মাড়ের মিষ্টি গন্ধে।

সবুজ এক দারুণ দামী আতরের সুবাসে বুঁদ হয়ে বাস-স্ট্যাণ্ডের দিকে হেঁটে চলল।

৪

বাসে উঠে সবুজের মনে পড়ল যে, খোকার জন্যে একটা হরলিকস্ কিনে নিয়ে যেতে বলেছিল হাসি। সবুজের কিছু মনে থাকে না। কোনোদিনই সংসারী ছিল না ও, কখনও হতে পারবে বলে বিশ্বাসও নেই। আর যে-বাজার পড়েছে তাতে বড় বড় সংসারীরাই লেজে-গোবরে হয়ে গেল, তা ও তো কোন ছার!

আসলে বিয়ে করাটাই ওর ভুল হয়েছে। এই ঘর-সংসারের দায়িত্ব নেওয়া। ওর ভিতরে একটা বিবাগী বাস করে—যার কিছুই ভাল লাগে না। আসলে ও বুঝতে পারে যে, দিন দিন ও ভিতরে ভিতরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, পলে পলে, প্রতিদিন। যা-কিছু ভালো ছিল, ভালোত্ব ছিল ওর বুকের ভিতরে, তা ধীরে ধীরে ক্ষয়ে গেছে। সাঁতার কাটার জোর নেই আর। খড়কুটোর মত ভেসে চলেছে নিশ্চিত আর্থিক ও আত্মিক সর্বনাশের দিকে।

ওর বিয়েব সময়, খোকা হওয়ার সময়, হাসির অসুখের সময়, ছোট বোন নীলার বিয়ের সময় প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা থেকে যা ধার হয়েছিল, তার ধার শোধ দিতেই সে আজীবন মরে থাকবে। তাছাড়া টাকার আজ কি দাম আছে কোনো?

পাঁচ-সালা, দশ-সালা, পনেরো-সালা, দূর্-শালা পরিকল্পনাগুলো দেখে দেখে ওর কেবলই সুকুমার রায়ের আবোল-তাবোলের "খুড়োর কলের" কথা মনে পড়ে। খুড়োর পিঠের সঙ্গে সোজাসুজি এক টুকরো কাঠ-বাঁধা—তা থেকে মাথার উপর দিয়ে সমান্তরালে আর একটা কাঠ বেরিয়েছে—সেই কাঠের প্রান্তে—খুড়োর মুখের কিন্তু ড় হাত দূরে এক টুকরো মাংস বাঁধা। ও এবং ওর মত পথেরাটি কোটি লোক খুড়ো হয়ে গেছে আজ। খুড়োরা

দৌড়চ্ছে, মাংস খাবে বলে দৌড়চ্ছে, প্রাণপণ দৌড়চ্ছে, কিন্তু মাংসের নাগাল পাচ্ছে না কিছুতেই। মুখের থেকে মাংস যত দূরে ছিল, তত দূরে তো বটেই, তার চেয়ে রোজই আরো দূরে সরে যাচ্ছে।

যাক গে।

ও ভেবে কি করবে? জনগণের প্রতিভূ আত্মত্যাগী সব সংসদ-সদস্য আছেন—তাঁরা নিশ্চয়ই দেশের কথা ভাবছেন। আর তাঁদের হোল-টাইম অকুপেশন তো দেশ-সেবা কবাই। তাঁদের মত এত এত সৎ, ন্যায়পরায়ণ, দেশহিতৈষীরা থাকতে সবুজরা দেশের কথা ভেবে কি করবে?

বিয়ের পর হাসি এবং ও ঠিক কবেছিল, ওদের একটি মাত্র সন্তান হবে। ছেলেই হোক কি মেয়েই হোক, তাকে ভালো করে মানুষ করবে, ভালো জামা-কাপড় পরাবে, ভালো স্কুলে দেবে, তার জন্যে প্রাইভেট টিউটর রাখবে। অনেক সখ ছিল ওদের। বিয়ের সময়, আজ থেকে দশ বছর আগে, টাকার যা দাম ছিল তাতে খোকাকে ভালোভাবে মানুষ করার কোনো অসুবিধেও ছিল না। কিন্তু সব গণ্ডগোল হয়ে গেল। এখন এই ছেলে-বউকে বাঁচিয়ে রেখে নিজে বেঁচে থাকাটাই বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাস থেকে নেমে বাড়ির দিকে আসতে আসতে একটু ঘুরে পরের গলিতে ঢুকল সবুজ।

ফণীর দোকান খোলা থাকলে হরলিকস্ পেলেও পেতে পারে। ফণী সবুজেরই সমবয়সী হবে কিন্তু দেখলে বেশী বয়সী বলে মনে হয়। ও সবুজের বন্ধু নয়। শত্রুও ঠিক বলা যায় না। সবুজ জানে না, ওকে ঠিক কোন্ শ্রেণীতে ফেলা যায়, ফেলা যেতে পারে।

ফণীদের অবস্থা আগে খুবই ভালো ছিল, হাসিদের বাপের বাড়ির পাশে মস্ত বাড়ি ছিল ফণীর বাবার। ফণী বাবা-মা'র

একমাত্র ছেলে। মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে ফণীর বাবা হঠাৎ মারা যান—চোদ্দ বছরের ফণীকে রেখে। মা মারা যান ছ'মাস বাদে। তারপর জ্যাঠা-কাকাদের অনুগ্রহে কোনক্রমে বেঁচে থাকেন ফণীবাবু—হাসির ফণীদা। একদিন সে আশ্রয়ও তার যায়। কাকারা সবই ঠকিয়ে নেয়, ফণীকে তাড়িয়ে দেয়।

ফণী মানুষটি একটু অদ্ভুত ধরনের। চোখ দুটো খুব অস্বাভাবিক। চোখে চাইলে মনে হয়, পৃথিবীর কদর্যতা দেখে দেখে, ব্যথা পেয়ে উদাসীন হয়ে গেছে ও। অথচ আশ্চর্য! সেই উদাসীনতার মধ্যে কোনো অনুযোগ নেই, বঞ্চনার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ নেই।

ফণী একজন সাধারণ, নির্ভেজাল, দুব্‌লা-পাতলা, মিন্‌-মিন্‌ করে কথা বলা বাঙালী। দোকান করেছে ইদানীং এ পাড়ায় একটা বস্তির পাশে। মনোহারী দোকান। এক বন্ধুর আর্থিক আনুকূল্যে। দোকানে দিনের প্রায় বারো ঘণ্টা কাটায় ফণী। দোকানেই রাত কাটায়। অন্ধকার, গুমোট দরজা-জানালা-বন্ধ টিনের ঘরে। বন্ধু ফণীকে মাসে আড়াইশো টাকা করে দেন। পরে নাকি পার্টনার করবেন।

প্রথমে সবুজ হাসিকে বলেছিল যে, দু'বেলা তো ফণী এখানেই খেতে পারে, পাঞ্জাবী ট্যাক্সিওয়ালাদের হোটেলে রুটি-তড়্‌কা না খেয়ে। হাসি বোধহয় বলেও ছিল কথাটা। ফণীবাবু বলেছিলেন এমনি-এমনি খাবেন না। মাসে একশো টাকা করে নিতে হবে। তাতে হাসি রাজী হয়নি।

সে বছর দুয়েক আগেকার কথা। আজকে সবুজের মনে হয়, হাসি রাজী না হয়ে ভালোই করেছে। আজকের দিনে একজন বাইরের লোককে দু'বেলা বাড়িতে এনে খাওয়াতে দেড়শো টাকার কম খরচে হয় না। তাছাড়া দু'বছর আগে সবুজ যে-চোখে দেখত ফণীকে, আজ আর সে চোখে দেখে না। এ দু'বছরে সবুজ অনেক

বদলে গেছে।

তবুও বাড়িতে ভালো-মন্দ কিছু রান্না হলেই হাসি খোকাকে দিয়ে খবর পাঠায়। ফণীবাবু এসে খেয়ে যান। এক রবিবারে মাছ ধরতে গিয়ে সবুজ একটা বড় কাতলা মাছ পেয়েছিল। ফণীবাবুকে ডেকে পাঠিয়েছিল হাসি। তাছাড়া বাড়িতে যেদিনই মাংস হয়, মাংসের ঝোল-ভাতও খেয়ে যান ফণীবাবু।

ফণীবাবুর চেহারায় ও চরিত্রে এমন একটা দুঃখী ভালোমানুষী ভাব ছিল যে হাসির এই ফণীদা-প্রীতিকে প্রথম প্রথম সবুজ অন্য চোখে দেখেনি। সবুজের অনুপস্থিতিতেই হাসির ফণীদা বেশী আসে হাসির কাছে, তা সবুজ জানত—কিন্তু তা নিয়ে কোনো দিনও মাথা ঘামায়নি ও। কিন্তু একদিন, সেই একদিনের ঘটনাটা এখনও মনে গেঁথে আছে সবুজের। সেদিন অফিস থেকে দুপুর বেলায়ই চলে এসেছিল ও জ্বর নিয়ে। জানে, দুপুরে হাসি বিশ্রাম করে শোওয়ার ঘরে, তাই বাইরের ঘরের কড়া না নেড়ে ও খিড়কির দরজায় ধাক্কা দিয়েছিল। রাম উঠোনের পাশে বারান্দায় শুয়ে ছিল—দরজা খুলে দিল। বারান্দায় উঠেই রামকে ও শুধিয়েছিল, বউদি কোথায়? রাম শুধু আঙুল দিয়ে শোওয়ার ঘর দেখিয়ে দিয়েছিল।

শোওয়ার ঘরে ঢুকতেই সবুজ চমকে উঠেছিল। হাসির শাড়ি-টাড়ি এলোমেলো—বিছানার বেড-কভার কুঁচিমুচি হয়ে রয়েছে।

ঘরের এক কোণায় ফণীবাবু ইজিচেয়ারে বসেছিলেন পায়জামা আর গেঞ্জী পরে। হাসির চোখ-মুখ প্রথমে ধরা-পড়া-চোরের মত মনে হয়েছিল সবুজের কিন্তু সে খুব বুদ্ধিমতী। পরমুহূর্তেই সামলে নিয়েছিল। ফণীবাবুর চোখে-মুখে কোনো পরিবর্তন লক্ষ করেনি সবুজ। এ লোকটার চোখ দুটো বোধহয় পাথরের। যে বিষণ্ণ ভাব তার চোখে আঁকা হয়ে গেছে, আঁকা রয়েছে, তা বুঝি

অন্য কোনোরকম সুখানুভূতিতেই আর বদলাবে না।

সেইদিনই সবুজের বুকের মধ্যে সন্দেহটা প্রথম উঁকি মারে। হাসির এই ফণীদা-প্রীতি যে নেহাতই এক গোবেচারার প্রতি সহানুভূতি নয়, এ কথাটা সেদিনই প্রথম মনে হয় সবুজের।

হাসিকে ও কিছু বলেনি। যদিও খুব অপমানিত বোধ করেছিল ও। যদি হাসি সবুজের চেয়ে ভালো, যে-কোনো-একদিক দিয়েও ভালো, এমন কাউকে ভালোবাসত, তবে তার অতটা দুঃখ হতো না; কিন্তু এই ফণী, মনোহারী দোকানে চুলের তেল আর সাবান বিক্রি-করা চুপচাপ মিনমিনে চরিত্রের আধবুড়ো ফণী যে ওকে হারিয়ে দিল, এই ভাবনাটাই ওকে বড় পীড়া দেয়।

এর পর থেকেই অনেকানেক ভাবে ফণীকে জব্দ করার চেষ্টা করেছে সবুজ। প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে।

যেদিনই হাসি ফণীকে খেতে বলেছে, সেদিনই ইচ্ছা করে ফণী আসার আগে, পেট ভরে যাওয়া সত্ত্বেও বেশী করে ভাত চেয়ে, বেশী করে মাংস চেয়ে খেয়েছে ও, যাতে ফণীর জন্যে আর হাসির জন্যে হাড় ছাড়া, হাঁড়ির নীচের একমুঠো ভাত ছাড়া কিছু না থাকে। অনেকদিন, অনেকবার ফণীর দোকান থেকে অনেক টাকার জিনিস এনেছে ধারে—কখনও পয়সা দেয়নি। ফণী নিশ্চয়ই তার মাইনে থেকে, তার খাওয়ার টাকা থেকে—হয়তো একবেলা খেয়েই সেই দাম শুধেছে তার বন্ধুকে। কিন্তু আশ্চর্য! ফণী এ-সব কথা কখনও হাসিকেও বলেনি; বলে না। বললে, হাসি সবুজকে হয়তো জানাত।

যখন ভাত-মাংস খেয়ে ফেলত সবুজ, তখনও হাসি কিছু বলত না মুখে। তার বড় বড় পাতাওয়ালা অবাক চোখে তাকিয়ে থাকত সবুজের মুখের দিকে আশ্চর্য হয়ে। সবুজ জানে, অনেকদিনই খাওয়া হতো না হাসির। ফণী যখন দোকান বন্ধ করে ঠা-ঠা রোদ্দুরে খেতে আসত, তখন হাসি সামনে বসে তাকে তার নিজের

খাবার খাওয়াতো।

একদিন ফণী আসার কথা শুনে সবুজ নিজে খেয়ে-নেওয়ার পর, হাসি যখন চান করতে গেছে, তখন সবুজ রান্নাঘরের শিকল খুলে বেড়াল দিয়ে সব ভাত-মাংস খাইয়ে দিয়েছিল। সেদিন হাসি অথবা ফণী কেউই খেতে পায়নি। ওরা শুধু জল খেয়ে থেকে রান্নাঘরের বারান্দায় বসে সারা দুপুর গল্প করেছিল। আশ্চর্য—ওখানে পাখা নেই, ওখানটা ভীষণ গরম, অথচ কি করে যে ওরা অতক্ষণ ওখানে থাকল, কিসের জন্যেই বা থাকল, তা ওরাই জানে। প্রেমালাপ নয়, কিছু নয়; শুধু দু'জনের মুখোমুখি দু'জনে বসে অনর্গল কথা বলে যাওয়া। যে-সব কথার মানেই নেই কোনো—যে-কথা কথাই নয়।

শোওয়ার ঘরে, পাখার নীচে, খোকাকে একপাশে নিয়ে, কোল-বালিশ জড়িয়ে শুয়ে-শুয়ে ওদের অভুক্ত রেখে, গরমে কষ্ট পাইয়ে এক অদ্ভুত আনন্দ পেয়েছিল সবুজ সেদিন।

সেইদিন, এতদিনের মধ্যে একমাত্র সেইদিনই, রোদ পড়লে, দোকান খোলার জন্যে ফণী চলে গেলে, হাসি ঘরে এসে ঢুকেছিল। খোকা পার্কে ফুটবল খেলতে বেরিয়ে গিয়েছিল। হাসি এসে সবুজের মুখের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অনেকদিন পর সবুজ ভালো করে, দিনের আলোয়, হাসির মুখের দিকে তাকিয়েছিল—ও বহুদিন পর হঠাৎই লক্ষ করেছিল যে, হাসি বড় রোগা হয়ে গেছে—গালের নীল শিরাগুলো দেখা যাচ্ছে—চোখের নীচে কালি পড়েছে। তবু সেই জীর্ণ শরীরে চোখের উজ্জ্বলতা নেভেনি একটুও, বরং বেড়েছে।

হাসির দু'চোখে জল টলটল করছিল। হাসি, যতক্ষণ সেই জলের ফোঁটা ধারা হয়ে গাল বেয়ে গড়িয়ে না পড়েছিল, ততক্ষণ চুপ করেই ছিল। চোখের জলের ধারা থেমে গেলে, শুধু একটা কথাই বলেছিল হাসি—একটা শব্দ। সবুজের ক্রূর নিষ্ঠুর চোখের

দিকে তাকিয়ে অস্ফুটে বলেছিল, ইতর!

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, তুমি বড় ইতর!

সেসব অনেক দিনের কথা। কিন্তু সবুজের বরাবরই মজা লেগেছে এই ভেবে যে, হাসির মত সাধারণ, কঙ্কালসার, রুগ্‌ণ, সমস্তক্ষণ সংসারের ভারে ন্যুব্জ, রান্নাঘরে পড়ে-থাকা মেয়ের মধ্যে কি দেখেছে ফণী? অবশ্য ফণী-ই বা কি? যেমন চেহারা, তেমন ছিরি! যেমন প্রেমিক, তেমনি তার প্রেমিকা। মনে মনে বলেছে সবুজ, আর নিপীড়ন করেছে ওদের দু'জনকেই। যে নিরুপায়, যে সমস্ত ব্যাপারেই তারই উপর নির্ভরশীল, তাকে নিপীড়ন করার মধ্যে, তাকে কাঁদাবার মধ্যে যে কী দারুণ আনন্দ, এ কথা সবুজের মত বোধহয় আর কেউই জানেনি।

সত্যি কথা বলতে কি, বহুদিন হতে চলল, হাসিকে আদর করে যতটুকু না আনন্দ পেয়েছে সবুজ, তার চেয়ে অনেক বেশী আনন্দ পেয়েছে ওকে পীড়ন করে, ওর চোখের সামনে ওর ভালোবাসার জনকে অভুক্ত রেখে, অপমান করে।

সবুজের ইচ্ছে আছে, একদিন ফণীর দোকান থেকে এক বাক্স দামী সাবান, অনেক ওডিকোলন, পাউডার ইত্যাদি ইত্যাদি কিনে নিয়ে গিয়ে কমলাকে দিয়ে আসবে। সবুজ দাঁতে দাঁত চেপে বলেছে, শালা ফণী। আমার বউয়ের সঙ্গে ভালোবাসাবাসি, তার ট্যাকসো দিবি না?

দূর থেকে ফণীর দোকানের ন্যাংটা বাল্‌বটা দেখা যাচ্ছিল। দোকানের পাশের খাটালে বর্ষার পোকা হয়েছে নানারকম। বাল্‌বটার চারপাশে পোকা উড়ছে।

কাছে যেতে সবুজ দেখতে পেল যে, একজন রিক্‌শাওয়ালা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দোকানের সামনে ফণীকে যা-তা বলে গালাগালি করছে—। পাঁউরুটি বাসি ছিল বলে।

ফণী উত্তেজনাহীন চাপা গলায় ওকে বোঝাবার চেষ্টা করছে।

বলছে, রুটি তো আমরা তৈরী করি না ভাই, কোম্পানী থেকে দিয়ে যায়—রুটি জমিয়েও রাখি না, কোম্পানীর লোক এলে ওদের নিশ্চয়ই একথা বলব।

এ-পাড়ায় রিকশাওয়ালাদের মধ্যে অনেক গুণ্ডা আছে। অনেকে আবার পার্টি-ফার্টিও করে। একে গুণ্ডা তায় আবার পার্টিবাজ—একেবারে সোনায় সোহাগা।

সবুজ একটু দূরে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা রেলিশ্ করছিল।

রিকশাওয়ালা অন্য কাউকে এমন করে কথা বললে ও হয়তো ঘুষি কষিয়ে দিত নাকে—তারপর যা হতো, হতো। ও জানে যে, ওর বাঙালের রক্তে রাগ চড়লে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। কিন্তু যা বলা হচ্ছে, তা ফণীকে। তাছাড়া রিকশাওয়ালাটাও ওর চেনা।

মনের ঝাল মিটিয়ে রোগাসোগা নীরব ফণীকে পালোয়ান রিকশাওয়ালা অপমান করল। 'কিন্তু যে অপমানের প্রতিবাদ করে না, তাকে অপমান করে মজা নেই'।

কিছুক্ষণ পর রিকশাওয়ালা বোধহয় নেহাতই ক্লান্ত হয়ে চলে গেল।

তখন সবুজ এগিয়ে এল ফণীর কাছে। ন্যাংটা আলোটায় ফণীর মুখটা বিব্রত, ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। ফণী খুব ঘামছিল। পোকাগুলো উড়ছিল ওর নাকের সামনে।

ফণী চমকে উঠে বলল, কি ব্যাপার? সবুজবাবু!

সবুজ বলল, একটা হরলিকস্ চাই খোকার জন্যে। আছে?

ফণী বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ।

বলেই শিশি বের করে, ধুলো ঝেড়ে শিশিটা এগিয়ে দিল।

সবুজ দামের কথা শুধোল না। কবে দাম দেবে তাও বলল না, ফণীর মুখের দিকে রিকশাওয়ালাটার অসভ্য চোখের চেয়েও নোংরা চোখে তাকাল ও।

তারপর বলল, চলি।

সবুজ পথে পা-বাড়ানোর পরই ফণী পিছু ডাকল ফিসফিস করে, সবুজবাবু ?

সবুজ ঘুরে দাঁড়িয়ে, ফিরে গেল ওর দিকে।

ও অনুমান করতে লাগল কী বলতে পারে ফণী! দাম চাইবে? বলবে কি যে, আর ধার দেবো না আপনাকে? কি বলে ফণী, তাই আঁচ করতে লাগল ও।

সবুজের মনে হলো, ফণী আগের থেকে অনেক রোগা হয়ে গেছে। দাড়ি কামায়নি বোধহয় আজ। দুপুরে খেয়েছে কি না কে জানে? ফণীর মুখে তাকিয়ে সবুজের মনটা হঠাৎ এক মুহূর্তের জন্যে দ্রবীভূত হয়ে উঠল। পরক্ষণেই ও আবার শক্ত হয়ে গেল।

ফণী বলল, বলছিলাম কি……।

সবুজ সোজা ওর চোখে তাকিয়ে বলল, বলুন না মশাই! অত আমড়াগাছি কিসের জন্যে ?

ফণী বলল, বলছিলাম যে, হরলিকস্‌টার দাম দিতে হবে না। ওটা তো খোকার জন্যে! দাম নেবো না।

সবুজ বলল, আচ্ছা! ঠিক আছে।

ধন্যবাদ দিল না, আর কিছু বলল না।

ফিরে যাবার সময় মনে মনে বলল, তা তো নেবেই না। তবে চাইলেই বা তোমাকে দিচ্ছিল কে ?

বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় ন'টা বাজল সবুজের।

বাড়ি ঢুকেই দেখল বাড়িতে খুশী-খুশী আবহাওয়া। রান্নাঘর থেকে ইলিশমাছের গন্ধ বেরুচ্ছিল। বাথরুমে চান করার শব্দ পাচ্ছিল সবুজ। হাসি চান করছে।

খোকা পড়ছিল তখনও, কিন্তু সবুজকে দেখেই দৌড়ে এল।

বলল, দ্যাখো বাবা, ফণীমামা কি দিয়েছে আমায়।

বলেই, একটা ফুটবল দেখাল।

সবুজরা এরকম ফুটবল ছোটবেলায় দেখেনি। সাদা-কালো চৌকো-চৌকো রঙ করা ফুটবলটার গায়ে। খোকা আবার উত্তেজিত হয়ে বলল, ফণীমামা রসগোল্লা এনেছে; ইলিশমাছ। মায়ের জন্যে শাড়িও।

সবুজ জামাকাপড় খুলতে খুলতে অন্যমনস্ক গলায় বলল, হঠাৎ?

খোকা বলল, ফণীমামা ঐ দোকানের পার্টনার না কি বলে, তাই হয়েছে। ফণীমামা বড়লোক হয়েছে বাবা, হ্যাঁ।

চোখ বড় বড় করে আবার বলল খোকা।

সবুজ বিরক্তিমাখা গলায় বলল, স্কুলের পড়া শেষ হয়েছে, না ফণীমামার গল্প করলেই কাল পড়া পারবে?

খোকা নিভে গিয়ে আবার পড়ার টেবলে ফিরে গেল।

হাসি চান করে তোয়ালে জড়িয়ে ঘরে এল। কোনো কথা বলল না সবুজের সঙ্গে। হাসির গা দিয়ে সাবানের গন্ধ বেরুচ্ছিল। এ অন্য সাবান। কমলার গা দিয়ে অন্যরকম গন্ধ বেরোয় চান করার পর।

হাসি খাটের উপর রাখা নতুন শাড়িটা যত্ন করে পরল। চুল ভিজোয়নি ও। বড় করে সিঁদুরের টিপ পরল, একটু পাউডার ঘষল গালে। তারপর খুব খুশী-খুশী গলায় সবুজের দিকে ফিরে বলল, বুঝলে, ভগবান বলে এখনও কিছু আছে।

সবুজ তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, আছে নাকি?

—আমার মনে হয় আছে। ভালো করলে এখনও ভালো হয়। ভালো লোককে ভগবান এখনও দেখেন।

সবুজ বলল, তোমার ফণীদাই তাহলে পৃথিবীর একমাত্র ভালো লোক। ভগবানের দৃষ্টি যখন আমাদের উপর পড়ছে না, পড়েনি, তখন আমরা সকলেই খারাপ লোক, কি বলো?

হাসি ওর আজকের আনন্দটা সবুজের সঙ্গে ঝগড়া করে নষ্ট

করতে রাজী ছিল না। বলল, সব ব্যাপারে তুমি নিজেকে টেনে এনে তুলনা করো কেন সকলের সঙ্গে ? তুমি কারো ভাল-হওয়া দেখতে পারো না, না ?

তারপর বলল, তোমার উপরও পড়বে হয়তো দৃষ্টি কোনোদিন, যদি ভালো থাকো ; ভালো হও।

পরক্ষণেই বলল, এক্ষুনি খাবে ? চান করবে না ?

সবুজ বলল, আমার খিদে নেই। খাবো না ভাবছি।

হাসি প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে গেল।

বলল, ওরকম কোরো না। খাও, লক্ষীটি! কতদিন পর ইলিশমাছ রান্না করেছি। মাছ ভাজা, মাছের তেল, মাছের ঝোল—বড় বড় পেটি। কালকে মাথা দিয়ে কচুর শাক করব আর কাঁটা-টাঁটা দিয়ে টক।

তারপর একটু চুপ করে থেকে স্বগতোক্তির মত বলল, ওরকম করতে নেই। লোকটার তো আপনার বলতে কেউই নেই, আমি ছাড়া ; পরক্ষণেই নিজেকে শুধরে নিয়ে বলল, আমরা ছাড়া। একটু ভালো ব্যবহার, একটু সহানুভূতির জন্যে যে-লোকটা দৌড়ে দৌড়ে আসে, তার সঙ্গে তুমি এমন ব্যবহার করো কেন ? সে তো তোমার কোনো ক্ষতি করেনি—সে যা পেয়েছে আমার কাছ থেকে, তোমার কাছ থেকে, তার বহুগুণ করে সে ফেরত দিয়ে দিয়েছে—। আমাদের ভালোবেসে, খোকাকে ভালোবেসে।

একটু থেমে হাসি বলল, তুমি যেন কী রকম! অদ্ভুত তোমার প্রকৃতি।

সবুজ নিজেকে সামলে নিল।

বলল, আচ্ছা, খাবো। চান করে আসি। ফণীবাবুর উন্নতি আজ তাহলে সেলিব্রেট করতেই হবে ?

চান-টান করে হাসির সঙ্গে অনেক, অনেক দিন পর একসঙ্গে রান্নাঘরের দাওয়ায় আসন পেতে খেয়েছিল সবুজ। অনেকক্ষণ

ধরে, রসিয়ে রসিয়ে খেয়েছিল।

খাওয়া হয়ে গেলে নিজে হাতে পানও সেজে এনেছিল হাসি।

তারপরে শোওয়ার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।

ছোট জিরো-পাওয়ারের নীলরঙা বাল্‌বটা জ্বলছিল ঘরে।

পান চিবোতে-চিবোতে সবুজ শুধোল, ফণীবাবু খেয়ে গেল না?

—না। ফণীদার খাবার তুলে রেখেছি। কাল দুপুরে খাবে। বলল, দোকানে অনেক হিসাবপত্রের কাজ আছে আজ।

ফণীর-আনা ইলিশমাছ, রসগোল্লা খেয়ে, পান চিবোতে চিবোতে ফণী সম্বন্ধে যেন হঠাৎ উদার হয়ে উঠল সবুজ।

বলল, ফণীবাবুর শরীরটা যেন কেমন ভেঙ্গে গেছে।

হাসি বলল, বেশীদিন বোধহয় বাঁচবে না। খাওয়া নেই, দাওয়া নেই; তার উপর কি অমানুষিক খাটুনি। ফণীদার একটা বিয়ে দেওয়া দরকার। তুমি তো কত জায়গায় ঘোরো, কত লোকের সঙ্গে মেশো, ভালো একটি মেয়ে দেখে দাও না ফণীদার জন্যে। ফণীদাকে সংসারী দেখতে পারলে আমার মনটা খুব শান্ত হবে। তারপর কি ভেবে একটু চুপ করে থেকে বলল, তোমার ভালো লাগবে না?

সবুজ পানের পিক গিলে বলল, কিন্তু ফণীদার এ-জন্মে আর কাউকে কি মনে ধরবে? একজন যে তার চোখ-জুড়ে আছে।

হাসি তক্ষুনি মুখ নামিয়ে নিল।

ও খুশী হয়েছে না দুঃখী হয়েছে সবুজের কথায়, তা সবুজ বুঝতে পারল না।

বলল, ফণীদারা কত বড়লোক ছিল, কত আরামে মানুষ হয়েছে। কাকারা সব ঠকিয়ে না নিলে কি ফণীদার আজকে এই অবস্থা হয়! আমি তো ফণীদার জন্যে কিছুই করতে পারলাম না, পারবও না। তুমি সবই জানো। তবু তুমি এমন করে ওকে কেন যে অপমান করো জানি না। তোমার বুকের মধ্যে কি আছে, আমার ভারী দেখতে ইচ্ছে হয়।

সবুজ কথা ঘোরাল।

বলল, সকলের বুকের মধ্যেই যা থাকে, হৃদয়-ফুসফুস, এই-ই সব।

হাসি বলল, হৃদয় আছে তোমার? একদিন হয়তো ছিল। আজ আছে কি না জানতে ইচ্ছে হয়।

সবুজ উত্তর না দিয়ে চেয়ার ছেড়ে বিছানায় এল। বলল, এসো, কাছে এসো, খাওয়া-দাওয়া ভালোই হলো তোমার ফণীদার দয়ায়, ফণীদার দয়ায় আজ তোমাকে একটু কাছেও পাওয়া যাক। তুমি আমার স্ত্রী, তুমি যে কেমন দেখতে, এই কথাটাই প্রায় ভুলে যেতে বসেছি।

হাসি ইতস্তত করছিল। হাসির চোখ দুটোতে ভয় জেগে উঠল। হঠাৎ।

সবুজ তাকে হাত ধরে কাছে টেনে নিয়ে একটানে ফণীর দেওয়া শাড়িটা খুলে ফেলল। এ-শাড়িটা প্রথম থেকেই সহ্য করতে পারছিল না সবুজ। শাড়িটা খুলে ফেলতেই হাসি আবার চেনা হাসি হয়ে গেল। বাড়িতে হাত-মেসিনে শেলাই করা শায়া, ব্লাউজ; অতি সাধারণ সবুজের স্ত্রী সেই হাসি।

হাসি সময় নষ্ট না করে ভিতরের জামাটা খুলে ফেলল। রোগা-হাসির শিশু-মুঠি স্তন দুটি অপ্রস্তুতভাবে ফুটে উঠল তার ফরসা বুকে।

হাসি মুখটা ফিরিয়ে নিল অন্যদিকে। এখনও বড় লাজুক ও; বিয়ের দশ বছর পরেও। সবুজ জানে না, ফণীর কাছেও হাসি এতখানি লজ্জাবতী কি না।

সবুজ আবার বলল, এসো।

বলেই, নিজের গলার স্বরের কঠোরতায় ও নিজেই চমকে উঠল।

বহু বছর হলো হাসি নিজের সত্তা হারিয়ে ফেলেছে। বলির পাঁঠার মত, কাঠগড়ার আসামীর মত। তার নিজের ইচ্ছা-

অনিচ্ছার কোনো দাম নেই তা জেনে গেছে সে। স্বামীর দীর্ঘ উপেক্ষার দ্বারা, তার স্বার্থপরতার দ্বারা নিপীড়িত হয়ে হয়ে, শিলীভূত হয়ে গেছে সে। এখন হাসি বোঝে না, ও বুঝতে ভুলে গেছে কিসের এই দম্ভ তার স্বামীর? কি সে দিয়েছে তাকে এ জীবনে? তবুও বশংবদ প্রজার মত একবেলা দু'মুঠো ভাত এবং অন্য বেলা দুটি রুটি-তরকারির বিনিময়ে এবং তাদের দু'জনের রক্ত-মাংসে গড়া ছেলেটির প্রতি ভালোবাসার আশ্চর্য শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত থেকে সে তার স্বামীব চাহিদা মিটিয়েছে।

কিন্তু সবুজের মত স্বামীরা যা কিছু পেয়েছে, পেয়ে এসেছে, সবই একতবফের পাওয়া। ওরা মিলিত হয়নি কখনও তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে। শরীরে অথবা মনে। ওরা হাসিদের ধর্ষণ করেছে। চিরদিনই। বিবাহিত জীবনের প্রথম দিন থেকেই।

হাসি শুয়েছিল চিত হয়ে। নীল আলোটা তার ছিপছিপে ফরসা স্নিগ্ধ নরম লাজুক শরীরে মাখামাখি হয়েছিল। সবুজ এগিয়ে গিয়ে হাসিতে পৌঁছল বমি-পাওয়া, ঘেন্না-হওয়া স্থূলতার সঙ্গে। হাসির নিথর ঠাণ্ডা নিস্পন্দ শরীরের গভীরে যে মন বলে একটা দারুণ উষ্ণ, স্পন্দিত ব্যাপার, তার খোঁজ এখন ও রাখে না। রাখতে চায়ও না বোধহয়।

আসলে হাসিকে চায়নি সবুজ। আজকাল ওকে একেবারেই চায় না।

সবুজ চোখ বুজে ফেলেছিল। কল্পনায় কমলার ঘর, কমলার বিরাট খাটটাকে চোখের সামনে দেখেছিল, আর দেখেছিল কমলাকে। আরও দেখেছিল সবুজ, একটি ঘামে-ভেজা, খোঁচা-খোঁচা দাড়িওয়ালা জীর্ণ ক্লিষ্ট মুখ। ফণীকে দেখেছিল সবুজ। তখনও দেখতে পাচ্ছিল।

হাসির শরীরের মধ্যে দৌড়ে যেতে যেতে সবুজ দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিল, দ্যাখ ফণী, তোর হাসি তোর কেউই নয়। হাসি

আমার, আমার একার।

হাসিও চোখ বুজে ফেলেছিল। ওর পাতলা ঠোঁট দুটো বোজা ছিল। হাসির বন্ধ চোখের সামনেও একটি সরল ভালোবাসায় জরজর, একজন ব্যথিত পুরুষের মুখ ভেসে ছিল। যে-মুখে কোনো অনুযোগ নেই, অভিযোগ নেই; যে-মুখে শুধু এক আশ্চর্য পরিণতিহীন ভালোবাসার আনন্দ।

হাসি মনে মনে, বুকের মধ্যে এক দারুণ চাপা কষ্টের মধ্যে নিরুচ্চারে বলছিল, ফণীদা, বিশ্বাস করো, তোমাকে আমি ভালোবাসি—তোমাকে কিছু দিতে যে পারিনি, তার জন্যে আমাকে ক্ষমা কোরো ফণীদা।

পুরোনো ও পরিচিত পথে দ্রুত কুচকাওয়াজ করার ভোঁতা একঘেয়ে ক্লান্তির পর সবুজ যখন হাসির পাশে শুয়ে পড়ল, তখন হঠাৎ ওর হাত লাগল হাসির গালে। সবুজ বুঝতে পারল, হাসির গাল ভিজে গেছে জলে।

বিরক্তির সঙ্গে বলল, জল এলো কোথা থেকে? হাসি, তুমি কাঁদছ নাকি? কাঁদছ কেন? এ আবার কি ন্যাকামি?

হাসি কথা বলল না প্রথমে।

তারপরে বলল, চোখে কি একটা পোকা পড়ল। একটা পোকা।

—ও! বলল সবুজ।

সবুজ জানে, পোকাটা কি! পোকাটা কে!

সবুজ জানে, এ পোকা ফ্লিটে কি ধুনোর ধোঁয়ায় মরবে না।

সবুজ পাশ ফিরে অন্যদিকে মুখ করে শুতে শুতে নিজের মনে বলল, ফণীটা আমাকে এই বিছানাতেও হারিয়ে দিল।

সবুজ যেন এই প্রথম জানতে পারল যে, সব খেলাতেই ওয়াক-ওভারের নিয়ম নেই। প্রতিপক্ষর অনুপস্থিতিতেও হারতে হয় কোনো কোনো খেলায়। জীবনের, ভালোবাসার; এই আশ্লেষের আশ্চর্য খেলায় তো নিশ্চয়ই।

৫

সবুজ অফিসে চলে যাবার পর হাসি খোকাকে স্কুলে পাঠিয়ে রান্নাঘরে ঢুকেছিল। ভালো করে কচুর শাক বেঁধেছিল ইলিশমাছের মাথা দিয়ে। টক বেধেছিল। কালকেব ঝোল ছিল। দু' টুকরো গাদার মাছে নুন-হলুদ মাখিয়ে রেখেছিল, ফণী এলে গরম গরম ভেজে দেবে।

ফণীর সকালে আসার উপায় নেই। আসতে আসতে সেই একটা-দেড়টা। দোকানের পিছনের উঠোনে টিউব-ওয়েলে চান করে এতখানি পথ ভাদ্রমাসের রোদে হেঁটে আসবে ফণী। ফণী আসার আগেই চান করে নেবে হাসি। একটা বাড়িতে-কাচা পরিষ্কার শাড়ি পরবে। সাবান দিয়ে ধুয়ে হাতের হলুদের ছোপ তুলবে। তারপর ফণী এলে একটু লেবু টিপে চিনি দিয়ে ওকে এক গ্লাস সরবত করে দিয়ে দু'জনে বসে অনেক গল্প করবে। তারপর দু'জনে একসঙ্গে বসে খাবে।

কাল সন্ধ্যেতেই খবরটা পাবার পর মোড়ের ডাকাতে-কালীর ওখানে গিয়ে পুজো দিয়ে এসেছিল হাসি ফণীর জন্যে। খুবই খুশী হয়েছে হাসি। এত খুশী ও বহুদিন হয়নি।

রান্নাঘরের টুলে বসে গরমে ঘামতে ঘামতে হাসি ছোটবেলার কথা ভাবছিল। ওদের বাড়িটা ছোট্ট একতলা ছিল। তার পাশেই প্রকাণ্ড লনওয়ালা ফুলবাগানের কেয়ারী-করা তিনতলা বাড়ি ফণীদের। ফণী স্কুলে যেতো প্রকাণ্ড গাড়ি চেপে। সামনে দরোয়ান ও ড্রাইভার বসে থাকত। হাসিদের স্কুলের সময় আর ওদের স্কুলের সময় প্রায় কাছাকাছি ছিল। হাসি যখন বেণী দুলিয়ে, ফ্রক পরে, বইখাতা হাতে নিয়ে রাসবিহারী অ্যাভিন্যু ধরে ওর

স্কুলের দিকে যেতো, তখন প্রায় রোজই এক জায়গায় ওর পিছন থেকে গাড়িটা এসে দাঁড়াত। ফণী ওকে ডাকত হাতছানি দিয়ে—তারপর নিজে গাড়ি থেকে নেমে দরজা খুলে দিত হাসির জন্যে। হাসিকে আদর করে বসাত—বসিয়ে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে নিজের স্কুলে যেতো। হাসির চেয়ে পাঁচ-ছ' বছরের বড় ছিল ফণী।

তখন থেকেই এক আশ্চর্য চোখে ফণী চেয়ে থাকত হাসির দিকে। মেয়েরা বয়সে ছোট হলেও বুদ্ধি ছেলেদের চেয়ে বেশী রাখে। হাসি বুঝতে পারত, এই চাউনির মানে। বিকেলে যখন ফণীদের বাড়ি যেতো হাসি, তখন নানারকম গল্প করত ওরা, খেলা খেলত, ফণীর পড়ার ঘরে ছুটির দিনে সারা দুপুর কাটাত—বই পড়ত।

সে-সব দিনের কথা চিরদিন মনে থাকবে হাসির। ফণীর মায়ের আদর-যত্নের কথা। ভাবলে অবাক লাগে। কতদিন হয়ে গেল।

ফণীর সম্বন্ধে হাসিকে যা চিরদিন চমৎকৃত করেছে, তা হচ্ছে ফণীর সুন্দর সভ্য ব্যবহার। এত ভদ্র মানুষ ও জীবনে দেখেনি। ফণীর চরিত্রে এমন কিছু একটা ছিল যে কোনো-কিছুই তাকে ময়লা করতে পারত না। অত বড়লোকের একমাত্র ছেলে হয়েও টাকা-পয়সার মোহ, গর্ব, দোষ কখনও কোনোভাবে ওকে স্পর্শ করেনি। ওর ব্যবহার ওকে ওদের বাড়ির সমবয়সী আর সকলের থেকে একেবারে আলাদা করে রেখেছিল। ফণীকে হাসি যত কাছ থেকে জেনেছিল, তেমন করে বেশী লোকে জানেনি।

হাসির ছেলেমানুষী মনে অনেক রামধনু উঠত। ফণীকে ঘিরে ওর কিশোরী মনে অনেক কিছু কল্পনা করত। কিন্তু নিজের মনের ইচ্ছাগুলোকে গলা টিপে নিজের মধ্যেই বোতল-বন্ধ করে রেখে দিত। হাসি জানত, ফণী যখন বড় হবে, যুবক হবে, তখন কোনো

বড়লোকের ন্যাকা মেয়েকে বিয়ে করবে, যাদের একমাত্র কাজ পিয়ানো-বাজানো, সাজগোজ করা আর মার্কেটিং করা। ও তখন জানত না যে, ফণীর এ অবস্থা হবে। জানলে, কখনও সবুজের সঙ্গে সম্বন্ধ করে বিয়েতে রাজী হতো না। বাড়ির সকলের সঙ্গে ঝগড়া করে ও ফণীকেই পেতে চাইত। ওর মত করে আজ আর কেউই জানে না যে, ফণীর দুর্দিনে ফণীর পাশে-পাশে ও থাকলে ফণীকে এতখানি কষ্ট পেতে হতো না।

হাসি এতদিনে বুঝেছে যে, জীবনের উপর, জীবনের গন্তব্য, জীবনের গতির উপর ওর মত একজন সাধারণ মেয়ের কোনোই হাত নেই। আজকে ফণী শুধু দু'মুঠো আদরের ভাত খাওয়ার জন্যে হাসির কাছে আসে। ফণীকে আদর করে কাছে বসিয়ে, একমুঠো ভাত খাওয়াবার মত একজন লোকও আজ আর নেই। যখন টাকা ছিল, তাকে সকলে মাথায় করে রেখেছিল, যে-মুহূর্তে তা থেকে সে বঞ্চিত হলো, তার আসন হলো ধুলোয়। কিন্তু ধুলোয় থেকে, ধুলো খেয়ে ফণী একটুও ছোট করেনি নিজেকে। তার চারপাশের মলিনতা তার শুভ্র মনকে একেবারেই ছুঁতে পারেনি। এত দুঃখ-কষ্ট, অপমানে কিছুতেই মানুষটা নীচু হয়ে যায়নি, ইতর হয়ে যায়নি সবুজের মত। আজকে হাসির জীবনে, মাঝে মাঝে ফণীদার মুখোমুখি বসে গল্প করা ছাড়া সুখ বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। ফণীদাই তার জীবনের সব সুখ।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হলো।

হাসি গিয়ে দরজা খুলল।

ফণী রোদে একেবারে ঘেমে জবজব করছিল।

দরজা খুলেই হাসি বলল, এসো, এসো। ঈস্‌স্‌, ঘেমে যে একেবারে জল হয়ে গেছ।

ফণী বলল, আর তুমি ?

হাসি অবাক হয়ে ওর নিজের দিকে তাকাল। ও দেখল,

তাই-ই তো, রান্নাঘরে বসে ও-ও তো একেবারে ঘেমে গেছে।

হাসি হাসল। বলল, আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। আমার এসবে কষ্ট হয় না।

ফণী বলল, তুমি চান করোনি এখনও? শরীরের উপর বড় অত্যাচার করো তুমি হাসি। যদি তুমি আমার আসা, আমার খাওয়া নিয়ে এত ব্যস্ত হও, এমন করো, তাহলে কিন্তু কখনো আসব না আমি।

হাসি চুপ করে রইল। জবাব দিল না।

তারপর ফণীকে পাখার নীচে বসিয়ে সরবত এনে দিয়ে বলল, তুমি একটু বোসো। আমি এই চান করে এলাম বলে।

চান করতে যেতে যেতে হাসি মনে মনে বলল, আমি তো রোজই এমন সময় চান করি, খাই—। কেউ তো আজ অবধি এ নিয়ে মাথা ঘামায়নি। তুমি কেন মাথা ঘামাও ফণীদা? তুমি তো আমার কেউ নও, কেউ হবে না এ-জন্মে। তবে কেন তুমি কষ্ট পাও, ভাবো, এই হাসির জন্যে?

চান-টান করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে এসে হাসি দু'জনের জায়গা কবল। রামকে বলল একটু গুছিয়ে-গাছিয়ে দিয়ে চান করে আসতে।

ফণীব পাতে দু' টুকবো ভাজা মাছ দিয়ে গরম মাছ-ভাজার তেল দিল পাতে। রাম কাঁচা লঙ্কা দিয়েছিল, পেঁয়াজও।

ফণী হাসল। বলল রামকে তুমি বলে দিও যে আমি কাঁচা লঙ্কা, কাঁচা পেঁয়াজ খাই না। রোজ রোজ পাতে নষ্ট হয়। তোমাদের বাড়িতে তোমরা সকলে বুঝি পেঁয়াজ-লঙ্কা খুব খাও?

হাসি হাসল। বলল, আমি খাই না। ও খায়। ওরা তো বাঙাল।

ফণী হাসল। বলল, এই জন্যে বাঙালরা খুব খাটতে পারে।

কিন্তু বড় রাগী হয় বাঙালরা।

—যা বলেছ। হাসি হেসে হেসে বলল।

হঠাৎ চোখ পড়ল ফণীর হাসির পাতে। তাড়াতাড়ি বলল, এই! তোমার মাছ ভাজা কই? মাছের ঝোল কই?

হাসি বলল, ওমা! আমরা সকলে তো কাল সব পেট-পুরে খেয়েছি। শুধু তোমার জন্যেই তোলা ছিল।

ফণী কথা না শুনে একটা ভাজা মাছ ও একটা ঝোলের মাছ তুলে দিল হাসির পাতে।

হাসি রেগে গেল। বলল, কি যে করো না, ভালো লাগে না। এই-ই তো খাবার। তাছাড়া আমরা তো সবাই-ই খেয়েছি। বিশ্বাস না হয়, রামকে জিজ্ঞেস করো।

ফণী বলল, খেয়েছ তো ভাল। একা একা খাওয়া আর আমার সঙ্গে বসে খাওয়া কি এক হলো?

হাসির ভালো লাগল। মুখে কিছু বলল না।

একটু পরে বিড় বিড় করে বলল, তোমারই আনা মাছ তোমাকেই ঘটা করে খাওয়াচ্ছি—তার আবার! তোমাকে আদর-যত্ন করি, তোমার জন্যে কিছু করতে পারি সে সামর্থ্য তো ভগবান দেননি আমাকে।

ফণী খাওয়া থামিয়ে মুখ তুলে বলল, তুমি বড় খারাপ। কী যে বলো না! কত কী খাওয়াও তুমি আমাকে--কত আদর করে খাওয়াও।

তারপর একটু চুপ করে থেকে কি যেন ভেবে বলল, আদর যে কি জিনিস, তা তোমার কাছ থেকে, তোমার কাছ থেকেই তো জানলাম। তাছাড়া শুধু খাওয়ানোটাই কি করা? তার চেয়ে কত বড় কত কিছু করো তুমি। আমিই বরং তোমার জন্যে কিছুই করতে পারি না। মেয়েরা আবার ছেলেদের জন্যে এসব করে নাকি? এসব তো ছেলেদের ব্যাপার; তাদেরই একার।

একটু থেমে, খেতে খেতেই বলল ফণী, সত্যি! সেই ছোটবেলা থেকে জানি না কেন, তোমাকে এক বিশেষ চোখে দেখেছিলাম। তারপর সব গোলমাল হয়ে গেল। তাই না? তবে তোমার স্বামী সবুজবাবু কিন্তু খুব উদার। এত উদারতা আমি খুব কম লোকের মধ্যে দেখেছি। উনি যদি না চাইতেন, তবে তো মাঝে মাঝে তোমাকে দেখতেই পেতাম না। যতটুকু কাছে পাই তোমাকে, তোমার কাছে থাকতে পাই, তাও পেতাম না। জানো, আমি না ওঁর কাছে খুব কৃতজ্ঞ।

হাসি চুপ করে খাচ্ছিল। কথা বলছিল না। ভাবছিল, ফণীদাটা বড় বেশী ভালোমানুষ। ও তো জানে না সবুজকে। কিছুই জানে না।

হাসি ভাবছিল, ফণীদা বড অল্পে সন্তুষ্ট—কেন জোব করে না সে—জোর করে তার যা-কিছু আছে কেন তা কেড়ে নেয় না তার কাছ থেকে—সবুজ যেমন করে তাকে ঠকায়, ঠকিয়ে এসেছে বছরের পর বছর, তেমন করে কেন ফণীদা সবুজকেও ঠকায় না!

হাসি মনে মনে ঠিক করে ফেলেছে, ফণীদার রোজগার আর একটু বাড়লে, একটা ছোট্ট বাসার খরচ আর তাদের দু'জনের খরচ জোগাবার মত অবস্থা হলেই ফণীদার কাছে চলে যাবে ও। আর ভালো লাগে না এ-জীবন। এই ঘরের মধ্যে শুধু ঘৃণা, শুধু সন্দেহ। দমবন্ধ হয়ে যায় হাসির। জীবনটা বড় একঘেয়ে, বড় নিরানন্দ হয়ে গেল। খোকাও হয়তো সঙ্গে যাবে, ও যদি যায়। হয়তো কেন? নিশ্চয়ই যাবে। খোকা ফণীদাকে যতখানি ভালোবাসে, তার বাবাকে সে তার সিকিভাগও বাসে না। সবুজ এত স্বার্থপর, এত নীচ, ও এত বেশী ভালোবাসে নিজের সুখ, নিজের আরাম, নিজের সুবিধাকে যে, তার কাছে অন্য কারোরই সুখের কোনো দাম নেই।

তাই তো ফণীদার উন্নতিতে হাসি এত খুশী হয়েছে।

পরক্ষণেই নতুন করে ভাবল হাসি, ভাবল ফণীদাটা আবার বড় বেশী নরম। এ-কথা তাকে বললে সে বোধহয় আঁতকেই উঠবে—সবুজের প্রতি কর্তব্যের কথার ফোয়ারা ফোটাবে। যে নিজের সুখ ছিনিয়ে না নেয়, ছোঁ মেরে না নেয় অন্যের কাছ থেকে, তার পক্ষে এ জীবনে সুখী হওয়ার আশা নেই। ফণীদাটা বড় মিনমিনে। এত ভ্যাবাগঙ্গারাম লোককে ভালোবাসা যায়, কিন্তু এ-রকম লোকের ভরসায় বাড়ি ছেড়ে বেরোনো যায় না। একদিক দিয়ে বুঝি লঙ্কা-পেঁয়াজ খাওয়া জেদী লোকগুলো ভালো। লোকগুলো মারুক বা বকুক, যাই-ই করুক, তাদের উপর বোধহয় পুরোপুরি নির্ভর করা যায়।

হাসিদের বাড়ির কাছেই একটা মালটি-স্টোরিড বাড়ি উঠছে। সারা দিন-রাত পাইলিং হচ্ছে—যার পুপ্-ধ্বপ্ পুপ্-ধ্বপ্ আওয়াজ সারাদিন শোনা যায়। প্রতিবারই যখন বিরাট লোহার হাতুড়িটা লোহার পাইপের উপর পড়ে তখন হাসিদের পুরোনো ভাড়া বাড়িটার অনেকদিনের ভিত কেঁপে ওঠে। হাসির বুকের মধ্যেও কি যেন কেঁপে ওঠে! ভয়-ভয় করে হাসির।

খাওয়া-দাওয়ার পর বাথরুমে আঁচাতে গেল ফণী। আঁচিয়ে বেরিয়ে আসার সময় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল—পশ্চিমদিকে চেয়ে বলল, আরে! কনকচাঁপার গাছ না? এতদিন তোমাদের বাড়ি এসেছি, কখনো তো চোখে পড়েনি?

হাসি মুখ তুলে চাইল। বলল, হ্যাঁ, জজসাহেবের বাড়ির কম্পাউণ্ডের গাছ—খুব সুন্দর না গাছটা?

—খুব সুন্দর, ফণী বলল।

তারপর থেমে বলল, মনে আছে, তোমাকে কনকচাঁপার গাছ চিনিয়েছিলাম আমি!

হাসির চোখ-মুখ জ্বলে উঠেই নিভে গেল, বলল, কই? মনে করতে পারছি না তো আমি! একেবারেই পারছি না।

ফণী হাসল, বলল, তুমি বড় ভুলে যাও। তোমার কিছুই মনে থাকে না।

তারপর বলল, আঁচিয়ে এসো, বলছি।

হাসি আঁচিয়ে এসে ওকে একটু মৌরী দিল।

ওরা মৌরী খেতে খেতে শোবার ঘরে এলো পাখার নীচে। হাসি খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে পা তুলে বুকের কাছে গুটিয়ে বসল। ফণী বসল ইজিচেয়ারে।

ফণী বলল, মনে আছে, তুমি আর আমি একদিন মা-বাবার সঙ্গে আমাদের দত্তপুকুরের বাগানে গিয়েছিলাম পিকনিকে। আমার মনে আছে, তুমি সেদিন একটা নীলের মধ্যে সাদা পোল্কা-ডট-তোলা ফ্রক পরেছিলে, মাথায় নীল রিবন বেঁধেছিলে—কালো জুতো পরেছিলে একটা।

তারপর একটু থেমে ফণী হাসতে হাসতে বলেছিল, হঠাৎ-মনে-পড়ে-যাওয়া কথাটা বলেছিল, তোমার বাঁ-হাঁটুব ঠিক উপরে একটা লালরঙা তিল ছিল, আমাকে দেখিয়েছিলে—মনে আছে? এখনও আছে তিলটা?

হাসির মুখ আচমকা আরক্ত হয়ে গেল।

মুখ নামিয়ে নিল হাসি।

তারপর আস্তে মাথা নোওয়ালো। কথা বলল না।

হাসির সব মনে পড়ে গেল। সমস্ত টুকরো টুকরো কথা। আশ্চর্য! ফণীদা কি করে এত বছবের কথা সব এমন করে মনে রেখেছে?

ফণী হাসির মুখে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ, তাবপর হেসে বলল, কি হাসি? নেই তিলটা?

এবার হেসে ফেলল হাসি।

হেসে বলল, আছে।

বলেই চুপ করে গেল।

আজ থেকে কুড়ি বছর আগের এমনি এক মেঘলা দুপুরে ফণীদের বাগানবাড়িতে কনকচাঁপা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে হাসিই নিজে হাতে তার ফ্রক তুলে ফণীকে তার কিশোরী উরুর তিলটা দেখিয়েছিল। চোখ বড় বড় করে, মুখ নাড়িয়ে বলেছিল, দেখেছ, আমি কেমন ফরসা—আমার লাল তিল।

সেদিন দেখিয়েছিল। আজ আর দেখানো যায় না। সহজ হবার দিন চলে গেছে। কুড়িটা বছর ঝরে গেছে মধ্যে। সেদিনের ফণীদা আর আজকের ফণীদায় কত তফাত। হাসিও কত বদলে গেছে।

একটু চুপ করে থেকে হাসি বলল, আপনার এত দিনের কথা মনে থাকল কি করে? আপনার স্মৃতিশক্তি তো খুব ভালো।

ফণী হাসল। বলল, একেবারে উল্‌টো। আমি কিছুই প্রায় মনে রাখতে পারি না। তবে কিছু-কিছু কথা আছে, কিছু-কিছু ঘটনা আছে মাথার মধ্যে, স্মৃতির মধ্যে জমা করা—বয়সের কোনো রাবারেই তা মুছবে না।

তারপর গম্ভীর গলায় চোখ নামিয়ে বলল, জানি না, হয়তো যা ভীষণভাবে মনে রাখতে চেয়েছিলাম, যা-যা কিছুতেই ভুলতে চাইনি, শুধু সেগুলোই মনে আছে। অন্য সব কথা, সব মনে না-রাখার কথা ভুলে গেছি।

হাসি বলে উঠল, আপনার কাকাদের ব্যবহারের কথাও ভুলে গেছেন?

ফণী এক অদ্ভুত ক্ষমাময় হাসি হেসে বলল, গেছি; বিশ্বাস করো।

রাগে হাসির গা জ্বলে গেল। এমন যীশুখ্রীষ্ট লোককে সহ্য করা যায় না। যারা মেরেকেটে, লুটেপুটে কিশোর ভাইপোকে বাড়ি থেকে একবস্ত্রে তাড়িয়ে দিল পথের ভিখারী করে, তাদের ক্ষমা করে দেওয়াটা কাপুরুষতা ছাড়া কিছুই নয়।

হাসি বলল, এটা ঠিক নয়। এটা আপনার চরিত্রের দুর্বলতাই প্রকাশ করে।

ফণী আবার হাসল। বলল, জানি না, হয়তো তাই। কিন্তু বিশ্বাস করো, যা হয়েছে তা ভালোই হয়েছে। তবে তোমার বিয়ে হওয়া অবধি যদি কাকারা আমায় না তাড়াতেন, তবে কি করতাম বলা যায় না। তোমার জন্যে, তোমার মুখ চেয়ে হয়তো লাঠি-সোঁটা ধরা যেতো। শুধু নিজের জন্যেই অত ঝামেলা করার কোনো মানেই হতো না। কিন্তু তোমার বিয়েতে তুমি আমাকে একটা খবর পর্যন্ত দিলে না। হয়তো ভালোই করেছ। অবশ্য তুমি বলতে পারো, আমি কেন এগিয়ে আসিনি। কিন্তু আমি কি করে আসতাম? তোমার সরকারী চাকুরে বরের কাছে সহায়-সম্বলহীন, পথে-পথে ঘুরে বেড়ানো, ফুটপাথে রাত কাটানো ভিখারীর কি দাম ছিল? ভালোই করেছি না এসে। আমার সঙ্গে তোমার জীবন গেঁথে গেলে তোমার বড় কষ্ট হতো।

বলতে বলতে ফণীর গলার স্বরটা কেমন রুক্ষ হয়ে এল।

হাসির মনে হলো, এ রুক্ষতা হাসির প্রতি নয়, তার কাকাদের প্রতিও নয়; এ রুক্ষতা সাধারণভাবে জীবনের প্রতি—পৃথিবীর সমস্ত নীচতা, স্বার্থপরতার প্রতি।

অবাক চোখে হাসি ফণীর দিকে চেয়ে রইল।

ফণী আবার বলল, বড় কষ্ট হতো হাসি, বড় কষ্ট দিতাম তোমায়—সে কষ্ট তুমি কি সইতে পারতে? বনেদী মিত্তিরের বংশধর এই ফণী মিত্তির। অনেকপুরুষ অনেক ভালো-মন্দ খেয়ে মানুষ, পিতৃপুরুষের বাড়ি-ভাড়ার টাকায় বসে খেয়ে, অনেক লোকের উপর অনেক অত্যাচার করে, অনেক গলায়-গামছা দেওয়া সম্মান কুড়িয়ে মানুষ; অনেক কিছু জমা ছিল সেসব ভোগের ঘরে, পাপের ঘরে—নইলে এত কষ্ট, এত অসম্মান, অন্য কেউ হলে সহ্য করতে পারত না। ভেঙে পড়ে যেত—ফুটপাতের উপর কুঁকড়ে

শুকিয়ে মরে থাকত।

বলেই, একটু থেমে ওর উপোসী, রোগা শিরা বের করা হাত দু'খানা হাসির সামনে ঘুরিয়ে হাসতে হাসতে বলল, কিন্তু এই ছাখো না, আমি কেমন দিব্যি বেঁচে আছি! কী দারুণ বেঁচে আছি।

হাসি চুপ করে ফণীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। এক অসহায় হাহাকারে তার মন ভরে গেল এবং সেই সঙ্গে ফণীদার প্রতি এক সুতীব্র সহানুভূতিতেও তার মন কানায় কানায় ভরে উঠল। সেই সহানুভূতি, যে সহানুভূতি একমাত্র মেয়েদের কাছেই আশা করা যায়, শুধু তেমন মেয়েদের কাছ থেকে—যারা কাউকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে কখনও ভালোবেসেছে।

ফণীও চুপ করে ছিল। ফণী ভাবছিল, মেয়েদের মত ভালোবাসতে, এমন কি ঘৃণা করতেও পুরুষরা কখনও পারবে না। হাসিকে ও জেনেছে—জেনেছে মেয়েদের ভালোবাসার স্নিগ্ধ প্রশান্ত অনুপ্রেরণার রূপে—আর তার ছোট কাকীমাকে দেখেছে তাকে ঘৃণা করতে। অথচ দু'জনেই মেয়ে। ছোট কাকীমা প্রায় ফণীর সমবয়সী ছিল। এক অশিক্ষিত ব্যবসাদারের একমাত্র সুন্দরী মেয়ে—ফণীর কাছ থেকে সে যা চেয়েছিল, তা পেলে ফণী আজকে ভিখারী হতো না। মেয়েরা যা চায়, যেমন করে চায়, তা এবং তেমন করে না পেলে বাঘিনীর মতোই হিংস্র হয়ে ওঠে। ছোট কাকীমার পটভূমিতে হাসির চরিত্র তাই বড় মুগ্ধ করে ফণীকে। এরা—এই দুই নারী—ফণী মিত্তিরের জীবনের দুই দিগন্ত। এক দিগন্ত পিছনে ফেলে এসেছে ফণী—ভুলে যেতে চেয়েছে—ভুলে গিয়ে সুখী হয়েছে। আর অন্য দিগন্ত—সন্ধ্যাতারার দিগন্ত; সে দিগন্তে হাসি।

হাসি হঠাৎ আব্দারে গলায় বলল, ফণীদা, তুমি রোজ রোজ আসবে। দুপুরে খাবে আমার সঙ্গে। রোজ। বুঝেছ?

ফণী চমকে উঠল।

তারপর হাসল। বলল, তা হয় না। সেটা ঠিক না। আমার এই জীবনেই আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি হাসি। তোমার জীবন তোমার—। তোমার স্বামী আছে, ছেলে আছে, তোমার সুন্দর শান্তির ঘর আছে, এর মধ্যে আমাকে মানায় না। বেশী কাছে টেনো না আমাকে। তাহলে দু'জনেরই দুঃখ বাড়বে। যা পাই, যতটুকু পাই তোমার কাছ থেকে, তাতেই আমি বড় খুশী আছি। বেশী লোভ নেই আমার। তাছাড়া, সবুজবাবুর কথাটাও ভাবো। এতে তাঁর প্রতি অন্যায় করা হয়।

হাসির আবার রাগ ধরে যায় ফণীর কথা শুনে। যে-লোকটার উপর পৃথিবীসুদ্ধ লোক অন্যায় করল, করছে এখনও—প্রতি মুহূর্তেই করছে, এমন কি হাসিও কম অন্যায় করেনি যার উপর—সে-লোকটা কার প্রতি কখন অন্যায় করে ফেলল, এই ভাবনাতেই মরে গেল। এটা বাড়াবাড়ি; এটা বোকামি। এর কোনো মানে নেই।

হাসি চুপ করে ছিল অনেকক্ষণ। ফণীর রুক্ষ-করুণ পুরুষালি ওর দিকে চেয়েছিল। বাইরে পেয়ারাওয়ালা পেয়ারা হেঁকে যাচ্ছিল, বাসনওয়ালী মেয়ের তীক্ষ্ণ গলার চিৎকারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নারকেল গাছগুলোর মাথার উপরে চিল উড়ছিল ঘুরে ঘুরে। রান্নাঘরের উঠোনে বড় বড় মাছি ভন ভন করে উড়ছিল—ঘরে বসে শোনা যাচ্ছিল তাদের ডানার ভনভনানি। কলঘরের কলে জল আসবে বোধহয় এক্ষুনি—চোঁ চোঁ করে একটা অদ্ভুত আওয়াজ করছে কলটা।

হাসি বলল, তুমি যে একটু আগে বললে, নিজের জন্যে এত ঝামেলা করার মানে নেই কোনো—এ-কথাটা আমার বুদ্ধিতে ঠিক বুঝলাম না। যত ঝামেলা সব তো মানুষ নিজের জন্যেই করে। নিজের সুখের জন্যেই।

ফণী অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। এবার ও উঠবে বোধহয়। দোকান খোলার সময় হয়ে এল।

ফণী স্বপ্নোত্থিতের মত বলল, তুমি ঠিকই বলেছ।

হাসি ওকে সহজে ছাড়ল না। বলল, কি ঠিকই বলেছি?

ফণী নিরুপায় হয়ে পড়ল যেন। বলল, তা করে। কিন্তু তেমন কিছু করতে পারে না, বড় কিছু; সত্যিকারের কিছু। নিজের জন্যে করে নিজের ঘর-সংসার, ছেলে-মেয়ে, নিজের বাড়ি-গাড়ি অবধি পাওয়া যায়, তার বেশী নয়। এর চেয়ে বেশী যারা চায় জীবনে, বড় কিছু করার মত, তারা সকলেই অন্য কারো জন্যে করে। কোনো মতের জন্যে; কোনো বিশ্বাসের জন্যে।

তারপরই বলল, যাক, এ সব কথা তুমি বুঝবে না।

হাসি বলল, বুঝব। বুঝব। বলো না ফণীদা, শুনতে ভালো লাগছে।

ফণী হাসল। বলল, সব কথা না বুঝলেও চলবে। সব কথা বুঝলে মুশকিল। যত কম বোঝো, ততই ভালো। যারা সুখী হয়, সুখী থাকতে চায়, তারা কমই বোঝে। বেশী বোঝার বড় বিপদ।

বলেই, ফণী বলল, আজ উঠি, কেমন? অনেক খাওয়ালে তুমি। একেবারে আইঢাই করছে শরীর। ভালোই হলো, রাতের খাওয়ার ঝামেলা করতে হবে না আর।

হাসি উদ্বিগ্ন গলায় বলল, ওরকম কোরো না ফণীদা—রাতে খেও। না-খেয়ে থাকতে নেই, পিত্তি পড়বে।

ফণী হাসল। বলল, ওরে বাবা! কত জানো তুমি! পিত্তি পড়বে!

বলেই হাসতে হাসতে বাইরের ঘরে এল।

ফণী বলল, যখনই আসি, খোকাটার সঙ্গে দেখা হয় না। খোকা খুশী হয়েছে ফুটবল পেয়ে?

—খু-উ-ব। খুশী আবার হয়নি!

—ওকে মাঝে মাঝে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। ওকে না-দেখলে মনটা ভালো লাগে না।

হাসি মুখ নীচু করে বলল, আচ্ছা! দেবো পাঠিয়ে।

হাসি দরজাটা খুলল। ফণী ওর টায়ার-সোলের চটি ফটাস-ফটাস করতে করতে চলে গেল।

ফণী চলে যাবার পর হাসি এসে একটু শুয়েছে। একটু পরেই খোকা আসবে। খোকাকে যে বিকেলে কি খাবার দেবে ভেবে পেলো না হাসি। একমুঠো ভাত বেঁচেছে, ভাবল, তাই দেবে একটু গুড় দিয়ে। দিনকাল যা পড়েছে, তাতে বেঁচে থাকাই মুশকিল। সবুজ সব কেটে-টেটেও নেহাত কম পায় না। এই মাইনের লোকের পক্ষে স্বামী-স্ত্রী, এক ছেলের সংসারে অনটন হবার কথা নয়। কিন্তু টাকার কি দাম আছে আর কোনো? কিছু একটা করা দরকার। কে করবে, কারা করবে, কেমন করে করবে, তাই ভেবে পায় না হাসি। নিজেদের জীবন না হয় যা করে হোক কেটে যাবে, কিন্তু খোকার কি হবে? পরীক্ষা সময় মত হয় না, হলে টোকাটুকি, মারামারি। পরীক্ষা যদি হলো, ফল আর বেরোয় না। পাসও যদি বা করল, তো চাকরি কোথায়?—কি করবে, কি খাবে ওরা বড় হলে! ওদের ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার। ওদের কথা ভাবলে সত্যি বড় ভয় করে হাসির।

দরজায় কে যেন কড়া নাড়ল। এ সময় তো কেউ আসে না। খোকার আসারও সময় হয়নি। আকাশে তাকিয়ে বেলা দেখল হাসি। নাঃ, বেলা তো পড়েনি।

উঠে গিয়ে দরজা খুলেই হাসি একটু ভয় পেয়ে গেল।

গোটা পাঁচ-ছয় ছেলে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। তাদের চেহারা, মুখের ভাব কিছুই ভালো লাগল না হাসির। তাদের মধ্যে যে সর্দার গোছের, সে অভদ্রর মত শুধোল, এখানে ফণীবাবু আছেন?

হাসি বিরক্ত হলো। বলল, আপনারা কে ?

ছেলেগুলোর মুখ পাথরের মত।

সর্দার বলল, আমরা ; আমরা।

তারপরই বলল, ফণীবাবু নেই ?

হাসি বলল, এসেছিলেন। চলে গেছেন।

ছেলেটি বলল, দোকানে ?

হাসির মুখ ফসকে বেরিয়ে পরেছিল, হ্যাঁ।

পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বলল, তা ঠিক জানি না।

ছেলেটি আবার বলল, আপনার কাছে এসেছিলেন কেন ? দুপুরে আঁসেন কেন ?

হাসির চোখ দুটো জ্বলে উঠল।

বলল, সে কথা তাঁকেই জিজ্ঞেস করবেন।

ছেলেটি বলল, আপনি রাগ দেখাবেন না। আমরা রাগারাগি পছন্দ করি না।

হাসি বলল, খেতে এসেছিলেন।

—রোজই আসেন ?

—না। আজ নেমন্তন্ন ছিল।

—আপনার স্বামী বাড়ি নেই ? আপনি নেমন্তন্ন করেছিলেন, না আপনার স্বামী করেছিলেন ?

হাসি রেগে গেল। ওর নিজের সাহস দেখে ও নিজেই অবাক হয়ে গেল।

ও বলল, আপনারা বড় বাড়াবাড়ি করছেন। আপনাদের আর একটা কথারও জবাব দেবো না আমি।

বলেই, দুম্ করে ওদের নাকের উপরেই দরজাটা বন্ধ করে দিল। দিয়েই দৌড়ে ওর শোবার ঘরে এল। এসেই খাটে শুয়ে পড়ল।

এতক্ষণ ভয়টা ওকে তেমন করে পেয়ে বসেনি। কিন্তু শোবার

ঘরের নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে আসার পরই ওর ভীষণ ভয় করতে লাগল। ওর দুর্বল রোগা শরীরে বুকটা ঢিপঢিপ করতে লাগল। বালিশে উপুড় হয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ কাঁদল হাসি। কাঁদতে কাঁদতে ওর বালিশ ভিজে গেল। এত কান্না যে ওর বুকে জমে ছিল, ও যে এত কাঁদতে পারে, ও নিজেও এর আগে কখনও জানেনি।

৬

হারাধন অনেকদিন থেকে ঘ্যানঘ্যান করছিল।

প্রথম প্রথম রীতিমত বিরক্তি বোধ করেছে সবুজ। ওকে বলেছে, এমন কথা আর বললে খুব খারাপ হয়ে যাবে।

কিন্তু হারাধন, একদিন ছেড়ে আরেকদিন প্রায় ববাবরই বলে চলে। বলে, এ-কাজটা দাদা আপনার করে দিতেই হবে। করে দিলে, কাঁরোর কোনো ক্ষতি নেই ; কিন্তু আপনার আমার বিস্তর লাভ।

হারাধন বয়সে সবুজের চেয়ে বছর দশেকের ছোট হবে। বাড়ির অবস্থা মোটামুটি ভালো। কসবায় নিজেদের ছোট একতলা বাড়ি আছে। দুই ভাই, এক বোন। বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। বাবা এখন পেনসান পান। ভাই যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। ওর যে এই বয়সেই এত টাকার কি দরকার হয়, সবুজ বোঝে না। একেবারে যে বোঝে না তাও নয়। লোকমুখে শুনতে পায় যে, হারাধন প্রায় নিয়মিত রেসে যায়। মাঝে মাঝে শনিবার ছাড়া অন্য দিনও দুপুর বেলাতেই 'আসছি' বলে হাওয়া হয়ে যায়।

ওর সাগরেদরা হাসাহাসি করে। বলে, শালা গেরোবাজ পায়রা হচ্ছে। ওড়া আরম্ভ করেছে। কোথায় যায় জানেন সবুজদা— ? পাড়ায় যায়!

সবুজ বোকার মত বলে ফেলেছিল, পাড়ায় মানে? ওদের পাড়া তো বহুদূর। সে তো কসবাতে।

ছেলেগুলো হাসে। বলে, আপনার কিস্সু হবে না। এ পাড়া সে পাড়া নয়।

অন্যরা চোখ নামিয়ে বলে, এ পাড়া অন্য পাড়া।

সবুজের বিশ্বাস হয় না। ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের ছেলে, দায়-দায়িত্ব নেই ঘাড়ে—এখনও বিয়ে-থা করেনি। কিন্তু কেন? কি জন্যে এত উপরি টাকার দরকার হয় ওর?

হারাধন আবার বলল, কি দাদা? পার্টিকে আসতে বলি?

সবুজ বলল, কেন আমাকে রোজ রোজ বিরক্ত করো? আমাকে ওসব বোলো না। আমার টাকার দরকার নেই কোনো।

হারাধন হাসে দাঁত বের করে, আঙুল দিয়ে দাঁতের ফাঁক থেকে সুপুরির কুচি টেনে বের করে সটাসট্ করে চিরুনি দিয়ে চুল ঠিক করে নেয়, তারপর সবুজের টেবলের উপরে রাখা হরজাই-রঙা কাঁচের গোলাকার পেপারওয়েটটা দু'আঙুলে টেবলের উপর ঘোরাতে ঘোরাতে বলে, এ-বড় মুর্খের মত কথা হলো। টাকার দরকার কার নেই দাদা? যে-লাখপতি তারও আছে, যে ভিখারী তারও। তাছাড়া তোমার তো কিছু করতে হচ্ছে না। যা ঝামেলা-ঝক্কি সব তো আমারই। আপনি শুধু কাগজপত্র ঠিক করে নিয়ে গিয়ে সাহেবকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়ে আসবেন। ঝামেলা তার পরে যদি কিছু হয়, সে তো সাহেবের।

সবুজ বলল, সাহেব আমাকে বিশ্বাস করেন। অমন বিশ্বাস-ঘাতকতা আমি করতে পারব না।

হারাধন রাগ দেখিয়ে বলে, কি অত সবসময় সাহেব-সাহেব করেন—ব্যাটা তো আমারই সমবয়সী। আর আপনার তাকে এত মান্যগণ্য করার কি? আপনি না বি-এ-তে বাংলায় আর ইকনমিক্সে লেটার পেয়েছিলেন? আপনার বাবা মোস্ট ইন্‌কন্‌সিডারেটের মত বে-টাইমে মরে না গেলে, আপনি কি এত কম বয়সে চাকরিতে ঢুকতেন? আর না ঢুকলে আপনিও কি কম্‌পিটিটিভ পরীক্ষায় বসতে পারতেন না? আর বসলে কি

আপনার মত ভালো ছেলে পাসও করতেন না? হুঁ! কত গাধা-গোরুকে দেখি কতশত ডিপার্টমেন্টের হাকিম হয়ে বসে আছে। এ কি আর সাহেবী যুগ যে, বাজিয়ে নেবে পাস করাবার আগে। বাবাঃ, কিছু কিছু মাল যা দেখি। হরি হরি!

হারাধন একটু থেমে দম নিয়ে বলল, এইসব সাহেবদের প্রতি ভয়-ভক্তি সব বাজে। আপনি দাদা এখনও পৌত্তলিক আছেন। এত সাহেব-পুজো কিসের জন্যে? কামাবার মওকা এসেছে, কামিয়ে নিন। টাকা উড়ে যাচ্ছে চার পাশে, শুধু খপাখপ ধরে নিন।

সবুজ বলল, দ্যাখো হারাধন, কষ্ট করে বেঁচে থাকলেও আজকেও দেশে অনেক লোক অনেস্ট আছে। না থাকলে—বলেই, কি বলবে ভেবে না পেয়ে সবুজ বলল, না থাকলে, দেশটা চলত না। থেমে যেতো।

—ফুঃ—বলে হারাধন থুথু ফেলল খানিকটা।

বলল, অনেস্ট আছে না কি কেউ? হ্যাঁ! আপনাদের মত দু'চারজন মুখ্যু আছে—এবং যাদের ডিসঅনেস্ট হবার উপায় নেই, তারাও। তাও বুঝতাম তারা শেষ অবধি অনেস্ট থাকলে। এ পর্যন্ত কত মক্কেল দেখলাম দাদা—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই ডিপার্টমেন্টেই দেখলাম—বুড়ো বয়সে—রিটায়ার করার আগে আগে ঠিক মুখ থুবড়ে পড়ল। আপনি কি মনে করেন বুড়ো বয়সে ডিস্অনেস্ট হওয়া, অল্প বয়সে ডিস্অনেস্ট হওয়ার চেয়ে কম অপরাধ? ভুল, সবুজদা ভুল। দুই-ই এক। তাছাড়া আপনার কি ধারণা দেশটা চলছে? একে কি চলা বলে দাদা? ঘুণ ধরে গেছে। আমরা সব ঘুণপোকা। যারা আমাদের কাটছে, আমরা যাদের কাটছি—সকলেই ঘুণ। —কিন্তু ঠাকুর্দাদের

তারপ ছিল, বাগানবাড়ি ছিল। তার চেয়ে সবুজদা, হয় প্রাক্‌টিকাল হবেন, খোলাখুলি ভালোবাসা ঢের ভালো। অনেক

মাঝামাঝি। আমার কথা ভাল না লাগে তো শহীদ হয়ে যান। অনামা অজানা শহীদ। পরিবারসুদ্ধ শহীদ। তবে, আপনাদের কবরে কেউ ফুল দেবে না।

সবুজ তবুও মুখ গোঁজ করে বসে রইল।

হারাধন বলল, আমি পার্টিকে খবর দিচ্ছি। সে আসাব পরও যদি আপনি মত না বদলান, তবে সে ফিরে যাবে—এই-ই তো! এর চেয়ে বেশী কিছু তো হবে না। অত ভাববার কি ?

সবুজ বাধা দেওয়ার আগেই হারাধন ফোনটা তুলে অপারেটরের কাছে নম্বর চাইল। নম্বর যথারীতি পেল না—সরকারী অফিসের টেলিফোন অপারেটররা খুব দেরি করে লাইন দেয়, যাতে সবুজের মত অনেস্ট লোকেরা হঠাৎ ডিস্অনেস্ট হয়ে যেতে না পারে।

কিন্তু হারাধন ছাডবার পাত্র নয়। অনুনয় করে বলল, দিদি, কাইণ্ড্লি লাইনটা দিন না—পরক্ষণেই মাউথপীসের মুখটা হাত দিয়ে বন্ধ করে বলল, শালীরা কি যে এত গল্প করে সারাদিন, শালীরাই জানে।

অধ্যবসায়ে সবই হয়। হারাধন অনেকক্ষণ পর লাইনটা পেল। সংক্ষেপে ও-প্রান্তকে বলল, "যাইয়ে! আপকো কাম্ বন্ গ্যয়া। জল্দি মাল লেকে আ যাইয়ে"।

কথা শেষ কবেই, ঘটাং করে রিসিভার ছেড়ে দিল হারাধন।

তারপর শিস্ দিতে দিতে আলমারী খুলে খুঁজে খুঁজে ফাইলটা বের করে সবুজের টেবিলে দিল। তারপর উল্টোদিকের চেয়ারে বসে সবুজের মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে গম্ভীর মুখে বলল, হ্যাভ ফেইথ্ ইন্ মী—আপনার ভালো হবে।

সিগারেটটা ধরিয়ে হারাধন [illegible] একটু ভাবল, তারপর বলল, জানেন দাদা, কেউ [illegible] মরে না গেলে, আ[illegible]সিটিতেই [illegible]রতে ঢুকতেন? আর না ঢুকলে আ[illegible] কাণ্ডারীর কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় বসতে পারতেন না? আর [illegible]রোয়া নেই।

কাণ্ডারী আপনার ফার্স্ট ক্লাস। এই যে—হাতে হাত মেলান সবুজদা ; আজ থেকে আপনার ফিনান্স ডিরেক্টর আমি হলাম। আপনি শুধু জানিয়ে দেবেন, কবে আপনার টাকা চাই—পেয়ে যাবেন। বদলে আপনাকে যা বলব, তাই-ই করতে হবে। এইটাই আমাদের ডীল্।

তারপর মুখটা কানের কাছে নামিয়ে বলল, ভয় নেই—চাকরি যাবে না—আরে আমাদের তো কোনো স্ট্যাটাস্ই নেই—আমাদের ধরে কোন্ শালা। চাকরি গেলে, অডিটে ধরলে, যাবে ঐ সাহেবদের—তাছাড়া—তাছাড়া—চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, আমাদের ইউনিয়ন নেই?—চাকরি আমাদের খায় কে? ওদের চাকরি গেলেও যেতে পারে ; আমাদের? আপনি পাগল?

অনেক অনেকক্ষণ সবুজ ফাইলটা সামনে করে বসেছিল।

ওর কান ঝাঁ-ঝাঁ করছিল। পেটের কাছে ব্যথা-ব্যথা করছিল। একবার বাথরুমে গিয়ে মুখে-চোখে জল দিয়ে এল। তবু গরম গেল না। সবুজের অনেক কথা মনে হলো। বাবার কথা। বাবার জ্বর হলে জ্বরের ঘোরে সবুজকে অনেক ভালো ভালো কথা বলতেন, নইলে বাবাকে কখনও জ্ঞান-দেওয়া বলতে যা বোঝায় তা দিতে শোনেনি সবুজ।

বাবা বলতেন, সবুজ, সবচেয়ে আগে চরিত্র, তারপর পড়াশুনা, তারপর খেলাধূলা।

সবুজ ভাবছিল, আজ তার চরিত্র নষ্ট হয়ে গেল। তারপরই ভাবল, কমলা? কমলার সঙ্গে তার সম্পর্কটা কি দুশ্চরিত্রতা?

না, না। নিজেই নিজেকে বলল, সেটা একটা পবিত্র ব্যাপার।

বাবাদের আমলে এক্সট্রা-মারিটাল সম্পর্কর কথা ওঁরা ভাবতে পারতেন না—কিন্তু ঠাকুর্দাদের আমলে অনেকেরই অনেক রক্ষিতা ছিল, বাগানবাড়ি ছিল। তার চেয়ে আজকের এই সহজ, সরল, খোলাখুলি ভালোবাসা ঢের ভালো। অনেক

অনেস্ট, সিন্‌সিয়র, অনেক সোজাসুজি। সবুজ তার মৃত বাবার সঙ্গে মনে মনে সওয়াল করল। বলল, বাবা, আগেকার জেনারেশনটাই ভণ্ড ছিল—কিন্তু আমরা নই।

তার গত-হওয়া বাবার সঙ্গে সওয়ালে জিতে সবুজের ভালো লাগল। চা-ওয়ালাকে ডেকে এক কাপ চা খেলো।

এমন সময় কমলা ফোন করল—বলল, এ্যাই! কি? ছুটি পেয়েছ?

—এখনও জানি না।

কমলা খুব অনুযোগের সুরে বলল, কি করছ তুমি? ভালো লাগে না। আমি কিন্তু যাওয়া ক্যান্সেল করছি তাহলে।

—না, না। বলল সবুজ। খুব সম্ভব পেয়ে যাব।

—সম্ভব-টম্ভব নয়। পেতেই হবে।

—আচ্ছা।

—কি আচ্ছা?

—যাব। আচ্ছা।

—আজকে একবার এসো না! বাবাঃ, কতদিন আসো না। তোমার ভীষণ পায়া ভারী।

তারপরেই বলল, হাসি কেমন আছে? হাসি আর খোকা?

সবুজ এড়িয়ে গিয়ে বলল, ভালো।

—ওদের অনেকদিন দেখি না। কমলা বলল।

—হুঁ। সবুজ বলল।

—ছাড়ছি এখন। কেমন?

—আচ্ছা। বলে সবুজ ফোন ছেড়ে দিল।

কমলা এক আশ্চর্য মেয়ে। ও একই সঙ্গে সবুজ ও হাসির খবর নেয়। একই স্বরে, একই আন্তরিকতায় ও খোকা এবং সবুজের কুশল শুধোয়। বোঝে না, সবুজ বোঝে না। কমলা হয়তো খুব বড় অভিনেত্রী, নয়তো কোনো দেবী-টেবী। মেয়েরা

সত্যিই বড় গোলমেলে।

বসে বসে ফাইলের কাগজ-পত্র, কনস্ট্রাক্শন রিপোর্ট, সাবমিটেড্-বিলের হিসাব, ওভারসিয়রের সার্টিফিকেট—সব দেখে-টেখে নিয়ে পে-অর্ডারটা রেডি করে রাখল সবুজ। যা হবে, তা হবে।

সবুজ ভাবছিল, কত টাকা দেবে হারাধন ওকে! দু'শো? পাঁচশো? না! না! এই কাজের জন্যে পাঁচশো দেবে কেন? সইটাবই তো দাম। আব সই তো সাহেবের। মধ্যে ওরা তো নেপো। বেচাবা সাহেব!

তাবপব ভাবছিল, হাবাধন যদি পাঁচশো টাকাই দেয়—তবে অতগুলো টাকা দিয়ে ও কি করবে? সত্যি ভাবা যায় না—পাঁচশো টাকা—হঠাৎ—আকাশ থেকে—ভাবা যায় না!

সবুজ ঠিক কবল, কমলার জন্যে কিছু একটা কিনবে। একটা ভালো কিছু। ভালো প্রেজেণ্টেশান! কিন্তু কি কেনা যায়? ভেবে পেলো না সবুজ।

যে গত দশ বছব বিয়ে, কি পৈতে, কি অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্নে পাঁচ টাকা কি খুব বেশী হলে দশ টাকা দামের বই, কি খেলনা, কি কলম বা ওবকম কিছু ছাড়া আর কিছুই কেনেনি—তার পক্ষে হঠাৎ দামী উপহার নির্বাচন করাও বড় কঠিন বলে মনে হলো। দামী জিনিস কি হয়, কত দামের হয়, সব ভুলে গেছে সবুজ। তারপর খোকার জন্যও কিছু নিতে হবে। ছেলেটাকে ফণী সেদিন ফুটবল দেওয়াতে কত খুশি! নাঃ, ওর জন্যে দামী কিছু কিনে নিয়ে যেতে হবে—খুব দামী, ফণীটাকে হারাতে হবে।

কিন্তু সবুজের ভালো লাগে না খোকাকে, খোকার চাউনি, খোকার কথাবার্তা। কেন যেন সবুজের মনে হয়, খোকা যথেষ্ট বড় হয়ে উঠলেই, ফুটবলে লাথি মারার মত করে ওকে লাথি মারবে। জানে না, হয়তো ভয়টা অমূলক। সম্পূর্ণই অমূলক।

সে তো বাবা হিসাবে সব কর্তব্যই করেছে। টাকা রোজগার করেছে, খাইয়েছে-দাইয়েছে—ন'মাসে-ছ'মাসে কিং কং, টারজান ইত্যাদি ছবিতেও নিয়ে গেছে—এমন কি চিড়িয়াখানাতেও, শীত-কালে ; কখন-সখনও। আর কি চাইতে পারে খোকা তার কাছ থেকে ? কি সে দেয় না, দেয়নি খোকাকে ? বাবার পক্ষে আর কি করণীয় ? সবুজ বুঝতে পারে না।

যাক, খোকার জন্যে রসগোল্লা কিনবে। আর ভালো শিকারের গল্পের বই—জঙ্গলের অ্যাডভেঞ্চারের গল্প—খোকাটা অন্ধকার ঘরে, গলির মধ্যের বদ্ধতায় থাকে বলেই বোধহয় ওর অ্যাডভেঞ্চারের গল্পের উপর এত ঝোঁক। যত সব বানানো, রাবিশের উপর। বেশ! তাই-ই হবে। তাই-ই কিনবে ও।

আর হাসি! হাসির জন্যে ?

সবুজ নিজেই নিজেকে বলল, আর হাসিও না, হাসি-হাসি কোরো না আর। কেন জানে না সবুজ, হাসিকে ওর কি রকম মনুষ্যেতর বলে মনে হয়। এমন কোনো জীবের মত, যে অত্যাচারিত হতে ভালোবাসে এবং যার উপর অত্যাচার করে আরাম পাওয়া যায়।

হাসিব জন্যে একটা শাড়ি নিয়ে যাবে—খুব দামী। ফণীর দেওয়া শাড়ির চেয়ে অনেক, অনেক দামী। আর নিয়ে যাবে চাইনীজ খাবার। অফিসে একদিন এই সাহেবের আগের সাহেব ট্রান্সফার হয়ে চলে যাবার আগে ওদের খাইয়েছিলেন। আঃ, মুখে লেগে আছে এখনও। চাও-মীয়েন না কি যেন বলে, আর চিলি-চিকেন পাকোড়া। একেবারে অবাক করে দেবে আজকে হাসিকে। মাসের সাতাশ তারিখেও অবাক করে দেবে। ডাকিয়ে পাঠাবে হাসির প্রেমিক ফণীকে। তারপর দু'জনকে সামনে বসিয়ে খাওয়াবে। হাঃ হাঃ। হাসির প্রেমিক!…

মিঃ সাহনী বিকেল তিনটে নাগাদ এলেন।

রুক্ষ, খুনী-খুনী চেহারা। টকটকে রঙ গায়ের। ফুল-ফুল একটা হাওয়াইন সার্ট—ইমপোর্টেড কাপড়ের ট্রাউজার। হাতে ডানহিল সিগারেটের প্যাকেট—পায়ে চটি।

বললেন, কেয়া সবুজবাবু, ইতনা রোজ বাদ দিমাগ্‌মে কুছ্‌ হোঁস্‌ আয়া ?

সবুজ বোকার মত 'হ্যাঁ'ও না, 'না'ও না একটা উত্তর দিল। মুখ নীচু কবে রইল।

হারাধন তাডাতাডি এসে পার্টিকে নিয়ে গিয়ে কি যেন সব বলল, ফিসফিস করে।

সবুজ একবাব সাহেবের ঘরে গেল। ফাইলটা হাতে করে।

সাহেব ব্যস্ত ছিলেন।

ফিবে এসে বলল, বীজী হ্যায়।

মিঃ সাহনী দু'হাত নাড়িয়ে, মাথা দুলিয়ে বললেন, কোঈ গাল্‌ নেহী।

সবুজ বোকার মত শুধোল, কি ?

হারাধন ইনটাবপ্রেটার হয়ে বলল, মানে, কোনো ক্ষতি নেই।

হাবাধন শুধু যে মানুষের মন বোঝে তা নয়, পাঞ্জাবী ভাষাটাও বোঝে।

একটু পর সবুজ আবার গেল।

সাহেব বললেন, কি ব্যাপার সবুজবাবু। সই করতে হবে ?

সবুজের পা কাঁপছিল। ওর গলাও কেঁপে গেল। বলল, হ্যাঁ।

—দিন, দিন—বলে সাহেব ফাইলটা টেনে নিলেন।

পরক্ষণেই বললেন, ওহো, একজন কনট্রাকটর একটা বল পয়েন্ট পেন দিয়ে গেছেন। আপনার জন্যে রেখে দিয়েছি। নিন—বলেই, ড্রয়ার খুলে পেনটা দিলেন।

সবুজ মুখ তুলে সাহেবের মুখের দিকে চাইল—সরল, ছেলেমানুষ, অপাপবিদ্ধ, সদ্বংশজাত, সুন্দর একটি মুখ—যে-মুখে পৃথিবীর

কালির ছাপ এখনও পড়েনি।

সাহেব তখনও সবুজের মুখের দিকে চেয়েছিলেন, বললেন, কি হলো ? পছন্দ হয়নি !

সবুজ বলল, হয়েছে—হয়েছে।

খস্‌স্‌-খস্‌স্‌ করে সই করতে করতে সাহেব বললেন, আপনার দেওয়া কোনো কিছুতে সই করতে আমার কোনো চিন্তাই হয় না। আমি আপনাকে বিশ্বাস করি। তারপর হেসে বললেন, আই নো দ্যাট ইউ ওন্ট্‌ লেট্‌ মী ডাউন।

সবুজের গলার কাছে কি যেন কী একটা দলা পাকিয়ে উঠল।

সবুজ মুখ নামিয়ে নিল। কথা বলল না।

সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে সবুজের মনে হলো যে, যে-লোকটা ঘরে ঢুকেছিল, তার সঙ্গে যে-লোকটা বেরোল তার কোনো মিল নেই। সাহেবদের মধ্যে অনেকেই এই সাহেবের মত নয়। এই ছেলেমানুষ লোকটি ভালো। অফিসার-লাইক অফিসার। ছেলেটাকে ডুবিয়ে দিল সবুজ। ভবিষ্যতে কিছু-না-দেখে সই করার মত সুস্থ সাহস আর হয়তো ও দেখাতে পারবে না। এই সরকারী গোলমেলে ক্রিয়াকাণ্ডর মধ্যে ও-ও আরেকজন ভীতু, ঝামেলাবাজ, সমস্ত লোকের জীবন দুর্বিষহ করা চাকরি-বজায়-রাখা অফিসার হয়ে যাবে। কিছুই করার নেই। এখন আর কিছুই করার নেই।

অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়েছিল সবুজ।

করিডোরের অন্ধকার কোণায় খামটা দিয়েছিল হারাধন সবুজের হাতে। বলেছিল, সবুজদা, এক আছে। আমারটা আমি নিয়ে নিয়েছি।

খামটা ভারী ঠেকেছিল। দশ টাকার কি পাঁচ টাকার নোট হবে হয়তো। সবুজ অফিসে দেখতে পারেনি। ডালহাউসীর এ-প্রান্ত অবধি হেঁটে এসে, পুরোনো রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছাকাছি

একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকল সবুজ। বেসিনে মুখটা আবার ধুলো। মনটা বড় অশান্ত লাগছিল। সমস্ত শরীরে একটা চাপা উত্তেজনা। ওর কাছে আজ সকালে মাসের এই সাতাশ তারিখে পাঁচটা টাকারও ভীষণ দাম ছিল—কিন্তু যেহেতু মনে মনে পাঁচ শ' টাকার প্রত্যাশা করে ফেলেছিল, সেই অনুযায়ী বাজেট বানিয়ে ফেলেছিল, এখন একশো টাকায় মন আর ভরবে না।

সবুজ একটা ডাবল্ ওমলেট আর চা-এর অর্ডার দিয়ে একবার বাথরুমে গেল। খামটা খুলল। খুলতেই, ওর হৃৎপিণ্ড যেন বন্ধ হয়ে গেল। সব একশো টাকার নোট। দশটা।

খামটা হিপ্ পকেটে রেখেছিল। এবার টাকাগুলোকে ভাগ ভাগ করে রাখল বিভিন্ন পকেটে। সবুজ ভাবল, আজ মিনি বাসও নয়, একটা ট্যাক্সি নেবে। আজ বাড়ির সামনে বহুদিন পর ট্যাক্সি করে নামবে। ফণীর দোকানে গেলেও হয়।

সবুজ ঠিক করল, ফণীর দোকানের যত ধার-ফার আছে সব শোধ করে দেবে আজ। যখন ওর কাছে টাকা ছিল না, তখন ফণীর টাকা মেরে আনন্দ পেয়েছে। আজ যখন উপরি টাকায় ওর পকেট ভরা, তখন সে-টাকা ফণীর মুখে ছুঁড়ে মেরে আনন্দ পাবে।

ওমলেট আর চা খেয়ে—ট্যাক্সি ধরার চেষ্টা করেও ট্যাক্সি পেলো না সবুজ। শুনল, ট্যাক্সি স্ট্রাইক হয়ে গেছে দুপুর থেকে। মাঝে মাঝেই এ-পকেটে ও-পকেটে হাত বোলাতে বোলাতে, হাঁটতে হাঁটতে ধর্মতলা অবধি এল। ফুটপাথে ইম্পোর্টেড নানারকম জিনিস বিক্রী হচ্ছিল। একটা বিলিতী পারফ্যুম কিনল সবুজ কমলার জন্যে। অন্যান্য সব জিনিস নিজেদের পাড়ায় পৌঁছেই কিনবে বলে ঠিক করল। লিণ্ডসে স্ট্রীটের কাছাকাছি এসে একটা মিনি বাসে উঠে পড়ে কমলাদের বাড়ির কাছে এসে নামল।

কমলা চান করতে যাচ্ছিল। বলল, বোসো, বোসো। কি

খাবে বলো ?

সবুজ বলল, তুমি বুঝি চান করতে যাচ্ছিলে ?

ফালতু প্রশ্ন। কমলা হাসল। বলল, হ্যাঁ, কেন বলো তো ?

কমলা ঘেমে গিয়েছিল।

বলল, সারা দুপুর লোড-শেডিং ছিল। গরমে সেদ্ধ হয়ে গেছি।

সবুজ কমলার দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিল। কপালের কাছে চুল লেপ্টে আছে ঘামে। বগলের কাছ দুটো ঘামে ভিজে গেছে। কেমন ক্লান্ত, রুক্ষ চেহারা কমলার। এই ঘর্মাক্ত ক্লান্ত কমলাকেও ভীষণ ভালো লাগল সবুজের : সুস্নাতা, সুগন্ধি কমলার মতই।

হঠাৎ সবুজ বলল, আমি তোমাকে চান করাবো।

কমলা হেসে উঠল। বলল, কত কী-ই না তুমি জানো ? আমি দু'বছরের খুকী ? চান করাতে হবে না। এখন বোসো তো লক্ষ্মীছেলের মত ! আমি আসছি এক্ষুনি।

সবুজ বলল, না। আজ বসব না। তোমার জন্যে একটা জিনিস এনেছি। কাছে এসো।

কমলা কাছে এল সরলভাবে।

সবুজ পাগলের মত ওর বুকে চুমু খেলো, বাহুমূলে চুমু খেলো।

কমলা খিলখিলিয়ে হেসে উঠল। বলল, এ মাঃ, ঘাম, ঘাম।

সবুজ ওর কোমর জড়িয়ে ধরল।

কমলা জোর করে হাত ছাড়িয়ে দিয়ে বলল, অমন কোরো না, আমি নোংরা। এখন নয়, এখন নয়। সব জিনিসের সময় আছে। এখন সময় নয়।

সবুজ ওর পকেট থেকে বের করে পারফ্যুমের শিশিটা কমলার হাতে দিল।

কমলা বলল, টোপাজ ? বাবাঃ, এর তো ভীষণ দাম। তুমি কেন এত খরচ করলে ?

পরক্ষণেই বাক্স খুলে, ছিপি খুলে নাকে গন্ধ নিল।

নিয়েই বলল, এ তো জাল! কোথা থেকে নিয়েছ। তোমায় ঠকিয়ে দিয়েছে। আমায় বললে না কেন? নিউ-মার্কেটে আমার জানা দোকান আছে—যেখান থেকে আমি সাবান-টাবান কিনি—সব ইম্‌পোর্টেড জিনিস রাখে ওরা।

সবুজের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

শুধোল, জাল? তোমাকে ভালোবেসে এই একটা জিনিসই এনে দিলাম, তাও জাল? দাও, আমাকে ফেরত দাও।

কমলা হাসল। বলল, না, ফেরত দেবো না। আমি এটাই ব্যবহার করবো। তাছাড়া ফুটপাথের দোকান—ফেরত নেবে না। উল্টে তোমাকে অপমানই করবে।

সবুজ বলল, ঈ-স্-স্!

কমলা আবার হাসল।

তারপর বলল, তাতে কি? জিনিসটাই না-হয় জাল? তোমার ভালোবাসাটা তো জাল নয়! নাকি তাও জাল?

সবুজ বলল, তুমি জানো না?

কমলা সবুজের কপালে হাত বুলিয়ে বলল, জানি, জানি যে, জাল নয়। আমি খুব খুশি হয়েছি। কিন্তু ভবিষ্যতে কখনও আমাকে আর কিছু উপহার দিও না।

সবুজ অবাক হয়ে শুধোল, কেন? কেন ও-কথা বলছ?

কমলা বলল, জানি না। আমার ভালো লাগে না। আমার মনে ভয় হয়, যদি কখনও উপহারটার দাম তোমার ভালোবাসার দামের চেয়ে বেশী বলে মনে হয় আমার! তুমি যা দাও, যা দিয়েছ তাতেই আমি খুশি। আমার তো এসবের অভাব নেই। কুমুদ তো আমাকে সবই দেয়, এ-সবকিছু। কুমুদের কাছে যা পাইনি, পাবো না কখনও, আমাকে শুধু তাই দিও। অন্য কিছু না। কিছুই নয়। বুঝেছ সবুজ?

সবুজ বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল।

তারপরই বলল, চলি, কেমন! আজ বড় তাড়া আছে।

হাসির জন্যে কাঞ্জিপুরম্ শাড়ি, খোকার বই, ফাউণ্টেন পেন, রসগোল্লার হাঁড়ি, এ-সব কিনে অনেক বোঝা হয়ে গেল সবুজের। এমন সময় দেখল সেই কাল্টু রিকশাওয়ালা ঠুং-ঠুং করে ওর দিকেই আসছে।

জিনিসগুলো রিকশার সীটের একপাশে তুলে দিয়ে সবুজ বলল, কাঁসারীপাড়ায় চলো। তুমি যে-দোকানে সেদিন রুটি নিয়ে ঝগড়া করেছিলে, সেই দোকানে। মনে আছে?

কাল্টু হাসল। বলল, আচ্ছা!

দোকানের ন্যাংটা আলোটা সেদিনও দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল। মাসের শেষ। দোকানে খরিদ্দার ছিল না। ফণী টুলে বসে কি একটা বই পড়ছিল। সবুজকে আসতে দেখেই উঠে দাঁড়াল।

রিকশাটা ফণীর দোকানের কাছাকাছি এসে পড়তেই সবুজ মত বদলাল। ঠিক করল, ফণীকে চাইনীজ খাবার খাইয়ে লাভ কি? এসব জিনিসের কদর ও কি জানবে? তার চেয়ে কাল ছুটি আছে, ওকে ডেকে মাছ খাইয়ে দেবে।

চাইনীজ-খাবারের প্যাকেটটা রিকশাতে রেখে, রিকশাটা একটু দূরে দাঁড় করিয়ে, সবুজ ফণীর সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

সবুজের তুলনায় ফণী অনেক বেঁটে। সবদিক দিয়ে ফণীকে খাটো লাগল সেদিন সবুজের। ওর পকেটে অনেকগুলো একশো টাকার নোট ছিল তো।

ফণী বলল, কিছু দেবো সবুজবাবু?

সবুজ হাসল, দাঁত চেপে, বিদ্রূপের হাসি।

বলল, না, না। অনেক তো দিয়েছেন। আর কিছু চাই না।

তারপর একটু থেমে বলল, আপনার কাছে আমার ধার কত? আজ শোধ করে দেবো বলে এসেছি। কারো কাছে ধার রাখা

আমি পছন্দ করি না। সব শুধে দেবো।

ফণী বিব্রত হলো। বলল, কি বলছেন আপনি! আমার কাছে আপনার কিসের ধার?

সবুজ বলল, হিসেবটা বের করুন না।

ফণী বলল, হিসেব রাখিনি। বিশ্বাস করুন। তাছাড়া, আমার কাছে আপনার কোনো ধার নেই। ধার যদি কিছু থাকে, তা আমারই আছে আপনার কাছে।

ফণীর রোগা হাড়-বের-করা মুখে উজ্জ্বল চোখ দুটি জ্বলজ্বল করে জ্বলে উঠল।

ফণী মুখ নামিয়ে স্বগতোক্তির মত বলল, আপনার কাছে বড় কৃতজ্ঞ আমি। কত-যে কৃতজ্ঞ, তা মুখে বলতে পারব না। তাছাড়া, যা সামান্য জিনিস দিয়েছি তা তো হাসির জন্যে, খোকার জন্যে, আপনাব জন্যেই। আপনারা কি আমার পর?

সবুজ মনে মনে বলল, শালা থিয়েটায় তো শিখেছ খুব!

মুখে বলল, তাহলে শোধ করতে দেবেন না? ঋণীই থাকতে হবে আমায়?

ফণী আবার নরম করে হাসল।

বলল, থাকলেনই বা ঋণী। আপনার কি ধারণা জীবনে ঋণ রাখা পাপ? এমন লোক কি কেউ আছে পৃথিবীতে যার কোনো ঋণ নেই অন্যের কাছে? আমারও কি ঋণ নেই?

সবুজ বলল, না, না, মশাই, ওসব বুঝি না। আমার বিবেক দংশন করে। টাকাটা আমি দিতে চাই।

ফণী হাসল আবার। বলল, আপনার বিবেক যে আছে এ প্রমাণ অন্তত আপনি পেয়েছেন। এটাই বা কম কি? যদি নাই-ই শোনেন আমার কথা, তবে আজ অন্তত নাই-ই বা দিলেন। ধার শোধার সময় তো পড়ে আছে।

সবুজ আর কথা বাড়াল না।

মনে মনে বলল, আমার শুকনো-স্ত্রীর জীবনে তুমি ফল্গুধারা শালা, ধার শোধ করলে যদি তোমার যাওয়া-আসা বন্ধ করে দিই আমি! সেই-ই ভয়। খালি মুখে মুখে মহত্ত্বের বুলি।

রিকশায় উঠে বসল সবুজ।

একটু এগিয়েই কান্টু রিকশাওয়ালা বলল, ঈ বাবুকো আপ্ জান্তে হেঁ!

সবুজ বলল, থোড়া থোড়া। মানে, তানি তানি।

কান্টু বলল, দিখাতা সিধী আদমী, মগর্ বহুত টেঁড়া হ্যায়। এক রোজ্ উস্কো হাম্ জান্সে মার দুংগা।

সবুজ উল্লসিত হলো।

বলল, আরে ঐসাহি হ্যায় উ আদমী। শিখ্লাও না এক রোজ ঠিক্সে।

কান্টু বলল, শিখ্লানা নেহী হোগা। হাম্কো কুছ্ করনা নেহী হোগা—যো লোগ্ করেগা, উ লোগ্ উস্কো পিছুমে লাগা হুয়া হ্যায়। ঠিক্সে শিখ্লায়গা।

সবুজ বাড়িতে পৌছে একটা পাঁচ টাকার নোট দিল কান্টুকে।

ভাড়া এক টাকা হয়। কান্টু চার টাকা ফেরত দিতে গেল।

সবুজ বলল, 'কোই বাত নেই—'। মিস্টার সাহনী যেমন করে অফিসে বলেছিলেন পাঞ্জাবীতে "কোঈ গাল্ নেহী"— তেমন করে।

কান্টু অনেকক্ষণ সবুজের চোখের দিকে চেয়ে রইল।

তারপর সেলাম করে বলল, আচ্ছা বাবু!

৭

শেষ রাতে একবার বাথরুমে গিয়েছিল সবুজ।

গলিতে দুটো কুকুরে মিলে কামড়া-কামড়ি ঝগড়া-ঝগড়ি করছিল।

খোকা পাশের ঘরে কুঁকড়ে-মুকড়ে শুয়েছিল মাথার বালিশটাকে কোল বালিশ করে। রাতে বৃষ্টি হওয়ায় শেষ রাতে বেশ গা ম্যাজম্যাজ করছিল। উঠে গিয়ে পাখার রেগুলেটরে হাত দিয়ে ও খোকার ঘরের পাখার গতিটা কমিয়ে দিল।

তাও খোকাকে একটা আলাদা ঘর দিতে পেরেছে ও। বহুদিনের পুরোনো ভাড়াটে ওরা। চল্লিশ টাকায় বাড়িটা পেয়ে গিয়েছিলেন ওঁর বাবা। আজকে বাবা নেই, কিন্তু সবুজের গরীব বাবা তাকে শুধু এই ফ্ল্যাটের ভাড়াটে-স্বত্ব দিয়ে গেছেন মরার সময়। ওর পক্ষে এটাও কম পাওয়া নয়। নইলে এ বাজারে ও যা মাইনে পায়, তাতে মাথা গোঁজার মত এরকম একটা জায়গা জোগাড় করা সম্ভব ছিল না।

কিন্তু খোকার প্রতি ওর কোনো মায়া-মমতা নেই। কেন যে নেই, তা ও জানে না। খোকা যত বড় হচ্ছে, ওর সঙ্গে ফণীর চেহারার, ফণীর মুখের আদলের, এমনকি ফণীর স্বভাবের সঙ্গেও বড় বেশী মিল খুঁজে পাচ্ছে সবুজ। অথচ বিয়ের পর-পর হাসি যে ফণী বলে কাউকে জানত, তাও অজানা ছিল সবুজের। ফণী এ-পাড়ায় মনোহারী দোকান করার পরই ওদের বাড়িতে তার যাওয়া-আসা আরম্ভ হয়েছে। তার আগেও যদি হাসির সঙ্গে তার যোগাযোগ থেকে থাকে, সেটা সবুজের অজ্ঞাতে। ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখলে সবুজ বুঝতে পারে যে, তার মনের সন্দেহটা

হয়তো অমূলক। কিন্তু তবু, কার সন্দেহই বা কবে কখন সত্য-নির্ভর ছিল? সন্দেহ হয়; সন্দেহ হয়।

হাসি উপুড় হয়ে শুয়েছিল। বুকের কাছে পা-দুটি গুটিয়ে নিয়ে। ঘুমের মধ্যে হাসিকে দেখে মনে হয়, ও ভাজা মাছটি উলটে খেতেও জানে না। শিশুর মুখের পবিত্রতার মত এক নরম শান্ত শিউলি ফুলের পবিত্রতা ওর সারা মুখে ছেয়ে থাকে। সবুজ অনেকক্ষণ হাসির পাশে দাঁড়িয়ে থাকল। হাসি ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করে কি যেন বলল। সবুজ কান পেতে শুনল, ফণীর নাম বলছে কি না হাসি। কিন্তু হাসির এই ঘুমঘোরের অস্ফুট ভাষা বুঝতে পারল না সবুজ।

নিজের জায়গায় গিয়ে শুয়ে শুয়ে ও ভাবল যে, পৃথিবীতে ও কাউকে, একজন কাউকেও ভালোবাসতে পারলে সুখী হতো। কিন্তু ও পারল না। নিজের স্ত্রীকে, নিজের শবীরেব শরিক একমাত্র ছেলেকেও ভালো লাগাতে পারল না। ও কি নিজেকে ভালোবাসে? একমাত্র নিজেকেই কি শুধু ভালোবাসতে পারল ও?

নানা কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল সবুজ। সকালে উঠে ও বাজারে যাবে। গলদা-চিংড়ি আনবে বলেছে। গলদা-চিংড়ি খাওয়াবে হাসিকে আর হাসির পেয়ারের ফণীদাকে! খোকাকেও খাওয়াবে। নিজেও খাবে। কিন্তু ফণীকে শুধু গলদা-চিংডি খাইয়ে, নিজে গলদা-চিংড়ির সঙ্গে আরো কিছু খাবে। সেই "কিছুর" নাম জানে না সবুজ।

সবুজ ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে ভাবল যে, জীবনের সব অনুভূতির এখনও নামকরণ করতে পারেনি মানুষ। এ-পর্যন্ত ক'টা অনুভূতিরই বা ব্যাখ্যা আছে অভিধানে? ব্যাখ্যা করা গেছে?

সকালে যখন সবুজের ঘুম ভাঙল, তখন পুরো বাড়িটা, পুরো গলিটা জেগে উঠেছে। খোকার ঘর থেকে খোকার পড়ার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। রান্নাঘর থেকে বাটনা বাটার গুব্-গুবানি।

জমাদার উঠোন ঝাঁটাচ্ছে ঝপাং-ঝপাং করে জল ঢেলে। পাশের বাড়ির ট্রানজিস্টারে তারস্বরে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজছে। এই ন্যাকা সঙ্গীত আজকাল ভালো লাগে না সবুজের। হেঁজি-পেঁজি-গেঁজি রোজ রোজ প্রায় একই গান প্রায় একই সময়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে গায়। একটু পরেই আরম্ভ হবে পল্লীগীতি। তারও একই সুর —রোজ একই সুর—শুধু কথা অন্য। বাঙলার কোন্ পল্লীতে যে আজ এই গান গাওয়া হয় জানে না সবুজ। জানার ইচ্ছাও নেই।

ঘুলঘুলিতে বাসা-বাঁধা পায়রাগুলো বক্-বকম্, বক্-বকম্ করে ঘুরে ঘুরে গলা ফুলিয়ে ডন-বৈঠকী মেরে ডাকছে।

সবুজ শুয়ে শুয়ে ডাকল, রাম !

রাম জানে এ ডাকের মানে।

এক কাপ চা এনে রাম বিছানার উপর রাখল। ডিসের উপর চা চল্‌কে পড়েছে আনতে গিয়ে। চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে হাঁটুর উপর ডিস গড়িয়ে চা পড়ে গেল। ভীষণ রাগ হলো সবুজের। কিন্তু আর কত রাগ করবে ? অনেক বছর ধরে এ-সব কথা বলেছে ও। জানেই না, কি করে যে মানুষকে চা দিতে হয় হাসি তা জানেই না। ছোটবেলায় দেখলে তো জানবে ?

সবুজও অবশ্য এ-সব দেখেনি। সবুজের পরিবারেও কোনো-রকমে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকাটাকেই একটা মস্ত কৃতিত্ব, মস্ত পাওয়া বলে জেনে এসেছে সবুজ। তবে কমলাদের কথা আলাদা। মনে পড়ে না, কখনও কমলা এমনকি কমলার ঝি পারুলও এমন করে চা দিয়েছে সবুজকে। কমলার বাড়িতে চায়ের কাপ হাতে করে বসে সবুজের মনে হয়েছে, চা একটা নিছক গা-গরম-করা পানীয় নয়। পেয়ালা-পিরীচের চেহারা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বাইরের শুকনো খটখটে ভাব—আর ভিতরের উষ্ণ পানীয়—এ-সব, এ-সবের সামগ্রিক ফল হচ্ছে চা। তাছাড়া, যে চা হাতে

হৃদয়ে আনে, তার মিষ্টি মুখ, তার নরম হাসি, এ-সবই চা। সবুজের মনে হয়, কমলা জানে, কি করে সবুজের চা বানাতে হয়। (এক চামচ চিনি, এক চামচ ভালোবাসা, আর এক চিলতে হাসি।)

আধো শুয়ে কেতুর-চোখে চা খেতে খেতে সবুজ ভাবছিল, ও কি কমলাকেও ভালোবাসে না? কমলাকে তো ও ভালোবাসে। কিন্তু কমলা সেদিন জাল পারফ্যুমটা হাতে নিয়ে বলেছিল, "এটা জাল তো কি? ভালোবাসাটা জাল না হলেই হলো।" কথাটার মধ্যে কি অন্য কোনো মানে ছিল? সবুজ কি একটা জাল লোক? ওর মধ্যে খাঁটি ব্যাপার কি একেবারেই নেই?

এ-সব ভাবনা বেশীক্ষণ ভাবা যায় না, তা ছাড়া না ভাবাই ভালো।

নিজেকে বলল সবুজ নিজে।

তারপর উঠে মুখ-হাত ধুয়ে আবও এক কাপ বিস্বাদ চা গিলে থলে হাতে বাজারের দিকে চলল।

হাসি গত রাতে জিজ্ঞেস করেছিল, ব্যাপারটা কি? এত টাকা? হঠাৎ? কোত্থেকে?

সবুজ বলেছিল, তোমার ফণীদার কাছ থেকে ধার করিনি। অনেকদিনের ব্যাক-পে জমেছিল, পেলাম একসঙ্গে।

—ওঃ। বলেছিল হাসি।

হাসির এই স্বভাবটাও সবুজকে চিরদিন বিরক্ত করেছে—ওর এই নিস্পৃহতা, ওর এই সমস্ত ব্যাপারে ঔদাসীন্য, পৃথিবীর তাবৎ ব্যাপারে কৌতূহলের অভাব, ভালো লাগে না। সবুজের ভালো লাগে না মোটে।

আজ গলদা-চিংড়ি কিনবে ও। বহুদিন পর ও তাই আজ বাজারে যাচ্ছে। শেষ বোধহয় খোকার ভাতের দিন গিয়েছিল। মাছ, মাছের স্বাদ, আজকাল প্রায় ভুলেই গেছে সবুজ। সবুজের

মত এবং সবুজের চেয়েও অনেক সচ্ছল লোকেরা মাছের চেহারাই দেখেনি বহুদিন।

মাসে এক-দু'দিন অফিস ফেরতা বৈঠকখানা বাজার ঘুরে আসে সবুজ। নিজের জন্যে শুটকি মাছ কেনে। ওদের বাড়ি চাটগাঁয় না হলেও, চাটগাঁ আর নোয়াখালির বন্ধু-বান্ধবেরা ওকে এ-মাছ খেতে শিখিয়েছে। ভালো করে পেঁয়াজ-লঙ্কা-তেল-রসুন দিয়ে রাঁধলে এক থালা ভাত খাওয়া যায়। অথচ হাসি খায় না। কিন্তু বাঁধে। খোকাও হাসির দেখাদেখি খায় না। একদিন সবুজ খোকাকে মেরেও ছিল এজন্যে। কিন্তু তবু খোকা খায়নি। তাই হাসি আর খোকার জন্যে সে দুশো গ্রাম কি আড়াইশো গ্রাম অন্য মাছ নিয়ে আসে কখনও কখনও।

গলদা-চিংড়ি ভালো রাঁধতেন মা। নারকোল-কোরা, সর্ষে, কাঁচালঙ্কা দিয়ে—আঃ, হলদে-হলদে, নরম-নরম—ভাবা যায় না। এক-এক থালা ভাত খেতো তখন শুধু চিংড়ির মালাইকারী দিয়ে। আর গলদা-চিংড়ির মাথা? বেসন দিয়ে ভাজা! টিপলেই জাফরান্-রঙা ঘিলু বেরোত—তা দিয়েও এক থালা ভাত খাওয়া যেতো।

কত মাছ! কত মাছ খেয়েছে ছোটবেলায়। দই-ইলিশ, ভাপের ইলিশ, সর্ষে-ইলিশ! ওর কিন্তু সবচেয়ে ভালো লাগত কাঁচালংকা কালোজিরে লাউ ডগা দিয়ে রান্না-করা পাতলা ঝোল। বাটির উপরে ঝোল টলটল করত—মিষ্টি লাউ-ডগার গন্ধ—ইলিশের ঝোলের গন্ধ—আঁশটে-আঁশটে—কী দারুণ!

পিসীমা রাঁধতেন তেল কই। বড় বড় কই—। তেল কাঁচালঙ্কা ধনেপাতা দিয়ে রাঁধা।

সেদিন অফিসে হারাধন বলছিল, চাকরি ছেড়ে দিয়ে মাছের এসেন্সের ব্যবসা খুলবে। ছোট ছোট হোমিওপ্যাথি শিশিতে নানা-রঙা মাছের এসেন্স বিক্রী করবে। রুই, ইলিশ, গলদা-চিংড়ি, কুচো-চিংড়ি, রুই, পোনা, ট্যাংরা—সব মাছের। শিশির সঙ্গে

ব্যবহার-বিধি, ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে ছাপা পাতলা কাগজে। লেখা থাকবে—খেতে বসে, সাবধানে শিশির ছিপি খুলে দু' ফোঁটা ভাতে ফেলে দিয়ে চোখ বন্ধ করে ভাত খেয়ে ফেলুন। খুশী না হলে পয়সা ফেরত। যারা খুব খুঁতখুঁতে সে-সব খদ্দেরের জন্যে রাবারাইজড্ ফোম্ দিয়ে ইলিশের টুকরো, আস্ত চিংড়ি, এ-সমস্ত মাছ তৈরী করে, ঠিক সত্যি মাছের মত রঙ করে সঙ্গে দেওয়া হবে। খাওয়ার সময় তারা সেই মাছকে টেপাটেপি করে আনন্দের সঙ্গে গবাস গরাস ভাত খাবেন। ব্যবহারের পর সেই মাছ সাবান দিয়ে ধুয়ে আবার হারাধনের কোম্পানীতে দিতে হবে।

হারাধন বলছিল, কে বলে দাদা দেশে সুযোগ নেই? এমন এমন সুযোগের সৃষ্টি হয়েছে আজ, যা কেবল অ-ক্ষয়েরী গুণ্ডী আর মোহিনী পানের মত অ-কৃত্রিম প্রজাতান্ত্রিক গণতন্ত্রেই সম্ভব। নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবার এমন একটা আইডিয়া মাঠে মারা গেল সবুজদা, শুধু একজন ফিনান্সিয়ারের অভাবে।

বাজারে ঢুকল সবুজ।

বাজারের এই গেট দিয়ে ঢুকলে সামনে ফুলের দোকান। তার মুখোমুখি মুদির দোকানগুলো। তারপর ঝাঁটা-থলে, ব্যাগ, ইত্যাদি-ইত্যাদি দোকান। তারপরই মাছের দোকান। মাছের দোকানের মুখোমুখি মাংসের দোকান।

দূর থেকে মাছের দোকানগুলো দেখা যাচ্ছিল।

বাঃ! বেশ বড়-বড় গলদা-চিংড়ি উঠেছে তো! সবুজ মনে মনে বলল। তারপরই ভেবে নিল, মাছের মাথা ভাজা, লাল-নীল ঠ্যাংয়ের চচ্চড়ি, মালাইকারী! ঈস্স্। সবুজের জিভে জল এল। সবুজ বড় করে ঢোঁক গিলল একটা।

দোকানদারের বয়স সাতাশ-আঠাশ হবে। প্যাণ্ট আর হাওয়াইন্-শার্ট পরা। গোলগাল ফরসা মুখ, গোঁফ আছে মুখে। যত্ন করে ছাঁটা।

সবুজ দূর থেকেই দেখল, অনেক লোক গলদা চিংড়ির কাছে ভীড় করছে, আর সরে যাচ্ছে। যেন শক্ লাগছে ইলেকট্রিকের।

সবুজের শক্ লাগবে না। তার পকেটে একশো টাকার নোট। মেহনতের নোট নয়, ফাঁকতালের নোট। বুকের একদিকে এই নোটটার জন্যে একটা গ্লানি বোধ করছে সবুজ, অন্য দিকে গলদা-চিংড়ির আনন্দ। সবুজ জানে, যতই দাম নিক, পনেরো, কুড়ি করে কেজিই নিক। তবুও নেবে সবুজ।

মাছওয়ালার সামনে এসে দাঁড়াল ও।

আত্মপ্রত্যয়ের স্বরে বলল, কত করে দিচ্ছ?

মাছওয়ালা ওর দিকে অপাঙ্গে একবার চাইল।

তারপর মুখ নামিয়ে নিল। জবাবই দিল না।

এবার সবুজও নিজের দিকে অপাঙ্গে চেয়ে নিল একবার। আধ-ময়লা একটা পায়জামা, পর পর তিন দিন অফিসে পরে যাওয়া শার্ট। ঘামের গন্ধ শুকিয়ে উঠে পচা ইঁদুরের মত গন্ধ ছাড়ছে। সেই মুহূর্তে নিজেকে ঘেন্না হলো সবুজের। ঘেন্নায়, নিজের প্রতি ঘেন্নায় সেই মুহূর্তে সবুজ মরে যেতো, যদি না তার পকেটে আজকের দিনের সব ঘেন্নার, সব গ্লানির প্রতিষেধক একশো টাকার নোটটা থাকত!

সবুজ মাছওয়ালাকে আবার শুধোল, কি গো? কত করে দিচ্ছ?

মাছওয়ালা একটা অপমানজনক ভঙ্গীতে হাত নেড়ে সবুজকে বলল, যান যান, কেন ভীড় বাড়াচ্ছেন?

সবুজের বাঙাল রক্ত মুহূর্তে মাথায় চড়ে গেল।

বলল, তার মানে?

মাছওয়ালা ওর দিকে চূড়ান্ত তাচ্ছিল্যের চোখে চাইল, তারপর পাশের মাছওয়ালাকে সালিশী মেনে বলল, রোয়াব্ দ্যাখ্ না! কত গলদা-চিংড়ি খানেওয়ালা রে—! মাছ তো এ জিন্দগীতে কিনবে

না —তবু দর করার কত ঘটা !

তারপর আবার সবুজকে বলল, মাছ নেবেন ? নেবেন না তো খামোখা ভীড় বাড়াচ্ছেন কেন ?

সবুজের এ-পাশে ও-পাশে বেশ কয়েকজন ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁরা বোধহয এ-রকম অপমানের শিকার রোজই হন। তাই সবুজের প্রতি বিদ্রূপ নয়, এক নীরব মুখ-নোয়ানো সমব্যথীর সমবেদনার চোখে তাকিয়ে তাঁরা সরে গেলেন।

সবুজকে জেদে পেয়েছিল।

সবুজ বলল, দ্যাখো ছোক্‌রা, মাছ কত করে, আমি তোমাকে তাই জিজ্ঞেস করছি।

মাছওয়ালাদের মধ্যে একটা হাসির রোল পড়ে গেল।

অন্যান্যরা বলল, দ্যাখ্‌ নবা, এতদিনে তার যোগ্য খরিদ্দার এসেছে।

নবা, ওরফে মাছওয়ালা ছোক্‌রা বলল, তিরিশ টাকা কেজি।

তারপরই সবুজের চোখের দিকে চেয়ে বলল, মাছ খাবার দম আছে ?

প্রথমে সবুজের ইচ্ছে হলো ঠাস করে একটা চড় লাগায় ছোকরাটার গালে। মনে হলো ওকে মাটিতে ফেলে ওর বুকের ওপর চড়ে দাঁড়ায়, তারপর ওর জিভটা টেনে ছিঁড়ে ফেলে।

পরক্ষণেই ও সামলে নিল নিজেকে। ওরা এক দল, আর ও একা। ওদের কাছে বঁটি, ছুরি। আর ওর খালি হাত।

সবুজ ভাবল মাছ না কিনেই ফিরে যায়। পরক্ষণেই ওর মনে পড়ে গেল, ফণীকে মাছ খাওয়াতে হবে। ফণী সেদিন ইলিশ মাছ কিনে এনেছিল। ওকে গলদা চিংড়ি না খাওয়ালেই নয়। মাছওয়ালার কাছে অপমানিত হওয়ার যে দুঃখ, ফণীকে গলদা চিংড়ি খাওয়ানোর দারুণ আনন্দের কাছে তা কিছুই নয়।

সবুজ ফস্‌স্‌ করে একশো টাকার নোটটা বের করে বলল,

মুখ সামলে কথা বলবে! দোকানদারী করছ, খরিদ্দার চেনো না?

একশো টাকার নোটটা দেখে মাছওয়ালা নবার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল।

বলল, বাবু, রসিকতা বোঝেন না কেন? রাগ করলেন নাকি আমার উপর! কত দেবো বলুন?

সবুজ রাগে কাঁপছিল।

বলল, এক কেজি।

নবা-মাছওয়ালা যত্ন করে ওজন করে এক কেজি মাছ সবুজের থলেতে ভরে দিয়ে সত্তর টাকা ফেরত দিল। হাতজোড় করে নমস্কার করল। হেসে বলল, আবার আসবেন।

সবুজ ওর সামনে থেকে সরে গেল।

মনে মনে বলল, আর কখনও আসব না।

সবুজ নারকোলের দোকানে গিয়ে একটা বড় নারকোল কিনল। কিনেই বাজার থেকে বেরিয়ে পড়ল।

বাজারের বাইরে বেরিয়ে ট্রাম লাইনটা পেরোল। পেরিয়ে রাস্তায় পড়তেই ওর সামনে একটা ডাব পড়ে থাকতে দেখল। কি হলো, কি হয়ে গেল জানবার আগেই সবুজ জোরে এক লাথি মারল ডাবটাকে। ডাবটা লাফিয়ে উঠে গড়াতে গড়াতে রাস্তা বেয়ে গিয়ে এক লাফে ফুটপাথে উঠে গেল।

একটি অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়ে হেঁটে যাচ্ছিল ফুটপাথ দিয়ে, তার পায়ে গিয়ে লাগল ডাবটা।

মেয়েটি মুখ ঘুরিয়ে দেখল। দেখে ঘৃণাভরে সবুজকে বলল, উজবুক্।

বলেই, চলে গেল।

সবুজের একই সঙ্গে আনন্দ এবং দুঃখ হলো।

আনন্দ হলো এইজন্যে যে, নবা-মাছওয়ালার মুখের সঙ্গে ডাবটার

আশ্চর্য মিল ছিল। নবার মুখে লাথি না মারতে পেরে ও ডাবের মুখে লাথি মেরেছিল। ভুলে গিয়েছিল যে, ও রাবারের চটি পরে আছে। আঙুলে খুব লেগেছিল, কিন্তু লাথিটা মারতে পেরে ওর খুব আনন্দ হয়েছিল।

দুঃখটা এইজন্যে যে, মেয়েটির পায়ে গিয়ে ডাবটার পৌছনো একটা নিছক দুর্ঘটনা। তাছাড়া মেয়েটি আঘাতও পায়নি। তার শাড়িতে আটকে গিয়েছিল ডাবটা। এই-ই মাত্র। তাছাড়া মেয়েটিকে দেখে মনে হয়েছিল শিক্ষিতা। সুন্দরী তো বটেই। একজন শিক্ষিতা সুন্দরী মেয়ের মুখে ওরকম বিশ্রী ঘৃণার ভাব আর ঐ উক্তি মোটেই মানাল না। সবুজের বড় খারাপ লাগল। ও জানে না, এই মেয়েটিকেও বোধহয় নবা-মাছওয়ালা কিংবা অন্য কেউ একটু আগে অপমান করেছে। মেয়েটিও নিশ্চয়ই ওরই মত বিরক্ত, ক্লান্ত, অপমানিত অবস্থার মধ্যে ছিল, নইলে এই সামান্য ব্যাপারে তার এত চটে ওঠার কারণ ছিল না।

সবুজ হাঁটতে হাঁটতে ওর চারদিকে, ওর পাশাপাশি হেঁটে যাওয়া, হেঁটে আসা বিভিন্ন নারী-পুরুষের মুখের দিকে তাকাল। যারা ওর কাছের, ওর সমতলের মানুষ, তাদের মুখের দিকে কখনও ও এমন ভাবে তাকায়নি এর আগে। প্রত্যেকের মুখেই কি যেন একটা জ্বালা, একটা অপারগতা; এই দিনের সঙ্গে, এই জীবনের সঙ্গে যুদ্ধ করার উপায়হীন অসহায়তার ফল—এক করুণ অনপনোদনীয় ক্লান্তি। আঁকা রয়েছে একই তুলিতে। যে তুলিতে ওর মুখও আঁকা।

সবুজ জানে, আজ সে বুঝে গেছে, কি করে এই নবাকে, নবার মত শত শত নবাকে ঠাণ্ডা করে দেওয়া যায়। একা একা কিছুই করা সম্ভব নয়। আজকের জীবনে নির্দল প্রার্থীর দিন শেষ হয়ে গেছে। সবুজের একটা নিশান চাই। যে কোনো একটা নিশানের নীচে গিয়ে তাকে দাঁড়াতে হবে; তার নিজস্ব বোধ,

নিজস্ব মতামত, নিজস্ব স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে তাদের খাতায় নাম লেখাতে হবে। তারপর গিয়ে বলতে হবে পার্টির দাদাকে—ক'দাদা, খ'দাদা, গ'দাদা, কোনো দাদাকে, বলতে হবে যে, নবাকে ঠাণ্ডা করো। একদল ছেলে গিয়ে নবার উপরে পড়বে নেকড়ের মত। নবা মৃত বোয়াল মাছের মত, তার মাছের মধ্যে, মাছের গন্ধের মধ্যে, কাঁকড়ার দাঁড়ার মধ্যে মুখ হাঁ করে পড়ে থাকবে। নবা থাকবে না আর।

কিন্তু সবুজও তো থাকবে না। সেই প্রতিশোধ, সেই দলবদ্ধতার মধ্যে সবুজের কোনো সবুজত্বই আর অবশিষ্ট থাকবে না। একদিন, যে-কোনোদিন ক'দাদা, খ'দাদা, গ'দাদা, তাদের যূথবদ্ধ, নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন, বোধহীন, একমাত্র স্ব স্ব দলমতে অন্ধ বিশ্বাসী নেকড়েদের হয়তো সবুজের বিরুদ্ধেই লেলিয়ে দেবে। নিজেরই সৃষ্টিতে, নিজের রক্ষকের দ্বারা মূল্যহীন হয়ে যাবে সে, হয়ে যাবে স্বাধীনতারহিত। বেঁচে থাকলেও, স্বমতের স্বাধীনতা ছাড়া, স্ব-ইচ্ছার আনন্দ ছাড়া এক নিছক নিশ্বাস ফেলা ও প্রশ্বাস নেওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যেই বেঁচে থাকবে সে। সে বাঁচা কি বাঁচা হবে?

সেই মুহূর্তে সবুজের মনে হলো যে, ও একা নয়। ওর সঙ্গে লক্ষ লক্ষ লোক আছে যারা একটা নিশান খুঁজছে, কিন্তু তার আশ্রয়ে গিয়ে দাঁড়াবার মত কোনো নিশানের নিশানা পায়নি। বরং ওরা সমস্ত নিশানকেই ভয় পেতে আরম্ভ করেছে। নিশানের উল্টোদিকে ওরা এগিয়ে যাচ্ছে। ভয় পেয়ে পেয়ে ওরা গুটিয়ে, কুঁকড়ে গেছে। ওরা নবা-মাছওয়ালার মত প্রতিদিনের হাজার নবা'র অপমান সয়ে, অসম্মান সয়ে, তবুও নিজের নিজের স্বাধীনতার লোভে বাঁচার মত বেঁচে থাকার দুর্মর লোভে ওরা বেঁচে আছে। আছে কি?

আপাতত কিছুই করার নেই। ভাবল সবুজ। এখন হারাধন

ছাড়া আর গতি নেই। হারাধন যে-পথে তাকে এনেছে, সেই-ই এখন ওর পক্ষে মানুষের মত বেঁচে থাকার একমাত্র পথ। পকেটে সব সময়ই একশো টাকার নোট রাখতে হবে সবুজকে। সে-টাকা কি করে সে পাবে, সেটা বড় কথা নয়; কিন্তু রাখতে হবে। নবা, গবা, ধবা যে-ই অপমান করবে, অপমান করতে চাইবে, তাদের মুখে নোটটা ছুঁড়ে মারবে। নবারা অমনি হাত জোড় করবে, নমস্কার করবে; বলবে, আবার আসবেন বাবু।

আসবে। সবুজ দাঁতে দাঁত চেপে মনে মনে বলল, আসবে সবুজ; কিন্তু একা নয়। যাদের কোনো দল নেই আজ, যারা পথেঘাটে, অফিস-কাছারীতে রোজ ছ'বেলা ঠোক্কর খেয়ে বেড়াচ্ছে, একা একা, আলাদা আলাদা হয়ে, তারাও একদিন দলবদ্ধ হবে। এক নতুন নিশানের নীচে। সে নিশানের রঙ জানে না সবুজ।

আসবে, সবুজ ভাবে, একদিন ও এবং ওরা সকলেই ফিরে আসবে।

কিন্তু কবে?

ফুটপাথ ধরে সবুজ বাড়ির দিকে আসছিল। এমন সময় হঠাৎ দেখল ফণী উদ্‌ভ্রান্তর মত দৌড়ে আসছে গলির ভিতর থেকে। ফণী দৌড়চ্ছে আর তাব পেছন পেছন একদল ছেলে।

এরা কারা সবুজ জানে না। জানতে চায়ও না। এরা সবাই-ই একই রকম। এরা কারা আপাতত সবুজের জানার ইচ্ছেও নেই। সবুজ এটুকু বুঝেছে যে, এরা ফণীর মিত্র নয়।

ফণী বড় রাস্তায় পড়েই সবুজকে দেখতে পেয়ে সবুজের দিকে দৌড়ে এল প্রথমে।

সবুজ কিছু বোঝার আগেই ফণী একটা থেমে-থাকা বাসে লাফিয়ে উঠল।

সবুজ জানে না ও কেন তা করল, কিন্তু বাজারের থলে হাতে করে সেও ফণীর সঙ্গে সেই বাসে লাফিয়ে উঠল।

সবুজ ভেবেছিল, ফণী দৌড়ে এসে সবুজকে বলবে, সবুজবাবু, আমাকে বাঁচান। আমাকে ওরা মারতে আসছে।

কিন্তু ফণী কিছুই করল না সেরকম।

বাসটা ছেড়ে দিল।

ছেলেগুলো বড় রাস্তা অবধি এসে আবার ফিরে গেল।

ফণী হাসল। সবুজের দিকে চেয়ে। বলল, আপনি বাজারের থলি হাতে এদিকে কোথায় চললেন?

সবুজ জবাব দিল না।

তিন-চার স্টপেজ বাদে ফণী নামবার জন্যে দরজার দিকে এগোল। সবুজও সঙ্গে সঙ্গে এগোল। দুজনে একই সঙ্গে নামল।

সবুজ বলল, কি ব্যাপার বলুন তো?

ফণী আবার হাসল। বলল, কিসের কি ব্যাপার?

—ঐ ছেলেগুলো কারা? ওরা আপনাকে তাড়া করল কেন?

ফণী বলল, আর যে জন্যেই হোক, কারো পকেট মারিনি আমি। ছেলেগুলো সবাই-ই ভালো ছেলে। একটুক্ষণের জন্যে ওরা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ওরাই আমাদের ভবিষ্যৎ। আমার ওদের উপর অনেক ভরসা।

সবুজ হাসবার চেষ্টা করে বলল, এইসব বকা-বাউণ্ডুলে গুণ্ডা ছোঁড়াগুলোর মধ্যে ভালোত্বটা কি দেখলেন আপনি?

ফণী বলল, ও আপনি বুঝবেন না।

—ওরা একটুক্ষণের জন্যে খারাপ হয়ে গিয়ে আপনাকে গোরু-তাড়া করল কেন?

ফণী হাসল। বলল, ওদের সঙ্গে আমার বিরোধ ঘটেছিল, তাই। কোনো ব্যক্তিগত ঝগড়া নয়। মত ও পথের ঝগড়া। ওরা ভাবে ওরাই ঠিক, আমি ভাবি—আমি। থাক্‌গে, ওসব জেনে

আপনি কি করবেন ?

সবুজ বলল, চা খাবেন ?

ফণী উদাসীন গলায় বলল, খেলে হয়।

ওরা ছু'জনে একটা সস্তার রেস্তোরাঁয় ঢুকল।

সবুজ বলল, শুধু চা ? সঙ্গে কিছু খান। ভেজিটেব্‌ল্‌ চপ্‌টপ্‌ ?

ফণী বলল, নাঃ, শুধুই চা।

তারপরই বলল, আপনি খান না ! আজ তো রবিবার। খেতে দেরি হবে নিশ্চয়ই।

সবুজ বলল, না, আমিও শুধু চা।

বলেই বলল, আপনার সঙ্গে সিগারেট আছে ?

ফণী অবাক চোখে তাকাল। তারপর বলল, আমি তো সিগারেট খাই না।

সবুজ বলল, আমিও খাই না, হঠাৎই খেতে ইচ্ছা করল।

ফণী বলল, বাইরে থেকে নিয়ে আসি ? খাবেন ?

—না, না। সবুজ বারণ করল।

চা খেতে খেতে সবুজ ভালো করে ফণীর চোখের দিকে তাকাল। ফণীর চোখ ছুটো বড় বেশী উজ্জ্বল। তাকিয়ে থাকা যায় না। সমস্ত শরীর অনাহারে, অত্যাচারে যত শুকিয়ে যাচ্ছে তত উজ্জ্বল হচ্ছে চোখ ছুটো।

একটু পর সবুজ বলল, আপনি কি পার্টি-ফার্টি করেন নাকি ? জানতাম না তো !

ফণী কি যেন বলতে গেল। তারপর থেমে গেল। হাসল শুধু।

—ঐ ছেলেগুলোর অত রাগ কেন আপনার উপর ?

—এমনিই—হয়তো একা একা নিজের মত নিয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচতে চাই বলে, নিজের ঘামে, নিজের পরিশ্রমে। জানি না কেন। কারণ একটা কিছু নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু কারণটা ওদের

নয়। কারণটা অন্য কারো। ওরা কার্য, কারণ নয়।

তারপর আবার স্বগতোক্তি করল, ছেলেগুলো ভালো। বাঙালী ছেলেগুলো হীরের টুকরো। ওদের মধ্যে আগুন ছিল। সেই আগুনে কি পোড়াবে ঠিক করতে না পেরে নিজেরাই পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

সবুজের একটু রাজনীতি করতে ইচ্ছে হলো। রবিবার সকালে সবুজের মত অনেক লেখা-পড়া জানা বাঙালীরই যেমন করতে ইচ্ছা হয়। চা খেতে-খেতে, খবরের কাগজ পড়তে-পড়তে।

সবুজ বলল, নেতাজীর পরে বাঙলায় একজনও লিডার হলো না, এ দেশের কি হবে বলতে পারেন?

ফণীর চোখ দুটো জ্বলে উঠল।

ফণী খুব নরম গলায়, মুখ নীচু করে বলল, কুকুরের বাচ্চার লিডার কখনও সিংহের বাচ্চা হয় শুনেছেন? আমরা যেমন, যেমন নেতা আপনি ডিসার্ভ করেন, নেতারাও তো তেমনিই হবে।

ফণীর কথাটায় যেন গালে চড় লাগল সবুজের।

ও মনে মনে বলল, রাজনীতি-ফীতি ভদ্রলোকের কাজ নয়। এসব নিয়ে আলোচনাও ভদ্রলোকের কাজ নয়। সবুজ ভাবল। তারপর মনে করবার চেষ্টা করল, কে যেন বলেছিলেন, "পলিটিক্স্ ইজ দা লাস্ট রিসর্ট অব স্কাউণ্ড্রেলস।" মনে পড়ল না।

যাক্, আপাতত ফণীর এইরকম কথায় ওর রবিবাসরীয় রাজনীতি-চর্চার সৌখীনতা উবে গেল।

চায়ের দোকানের সামনে দিয়ে একটা নেড়ি কুত্তাকে লেজ নাড়িয়ে চলে যেতে দেখেই, সবুজ দোকানের ভিতরে মুখ ঘোরাল।

ভাবল, এই লোকটা ডেঞ্জারাস্। এর সঙ্গে বেশীক্ষণ থাকাই ঠিক নয়। ভীষণ রাগ হলো হাসির উপর। প্রেম করার লোক

পেল না আর!

চায়ের দাম দিতে দিল না ফণী সবুজকে।

নিজেই দিল। বলল, আপনার কাছে আমার অনেক ঋণ। এক কাপ চা খাওয়ানোর আনন্দ থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না।

সবুজ বলল, আজ দুপুরে কিন্তু আপনি আমাদের ওখানে খাবেন। সেইজন্যেই আমি নিজে হাতে বাজার করতে এসেছিলাম।

ফণী খুব বিব্রত বোধ করল।

তারপর বলা উচিত কি না ভেবে বলল, আমার পক্ষে আজ যাওয়া মুশকিল। ছেলেগুলোর মাথা ঠাণ্ডা হলে যাবো। ছেলেমানুষ তো! রাগের মাথায় হয়তো এমন কিছু করে বসবে, যা করা উচিত নয়। রাগটা পড়বার সুযোগ দেওয়া উচিত।

তারপর বলল, আপনি কিছু মনে করবেন না। হাসিকে বলবেন।

একটু থেমে বলল, খোকা ভালো আছে? খোকা আপনার দারুণ ছেলে। অন্য দেশে জন্মালে কত সুযোগ পেতো, আরো ভালো হবার কত সম্ভাবনা ছিল। ভাবলে খারাপ লাগে।

—অন্য ঘরে জন্মালেও হয়তো হতো। বলল সবুজ।

—বড়লোকের ঘরে বলছেন? ফণী শুধোল।

সবুজ বলল, হ্যাঁ।

সবুজ জানে, সবুজের পক্ষে খোকাকে সব সুযোগ দেওয়া সম্ভব নয়, এ-কথাই ফণী বলতে চাইছে। কিন্তু ফণী জানে না, সবুজ আর সে-সবকে ভয় করে না। সবুজের এখন হারাধন আছে। সব হারাতে বসেও, সর্বনাশের দরজাতে এসেও ও হারাধনের জন্যে বেঁচে যাবে। হারাধনই এখন লোকাল গার্জেন সবুজের। খোকাকে সে বড়লোকের মতই মানুষ করবে।

ফণী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমি কিন্তু ও-কথা মানি না। বড়লোকের ছেলেরাই তো বেশী অকালকুষ্মাণ্ড হয়, আত্মসম্মানজ্ঞানহীন হয়। বড়লোক গরীবলোকের কথা বলছিলাম না, মানুষ হওয়া আর অমানুষ হওয়ার কথা বলছিলাম।

সবুজ মনে মনে বলল, ফণীর দিন ফুরিয়েছে। বড় বেশী বাতেল্লা করছে ও। জ্ঞানে যেন ভরপুর। শালা মনোহারী দোকানের ফিলসফার্। খোকা কি তাহলে তোমারই ছেলে? খোকার প্রতি এত দরদ কিসের?

ফণী আবারও বলল, খোকা কিন্তু আপনাকে ভয় পায়। সেটা কিন্তু ভালো না। বাবাকে ভয় পাবে কেন? ভয় কাউকেই পাওয়া উচিত নয়। ভয় বুকে করে বাঁচাকে বাঁচা বলে না। জানি না, মনে হয় খোকা একদিন একথা জানবে। বড খাঁটি ছেলে ও।

—পড়াশুনায় তো লবডংকা। সবুজ বলল।

ফণী হাসল। বলল, হ্যাঁ। স্কুলের পড়াশুনায়।

তারপর বলল, ওর হয়তো ভালো লাগে না। তাছাড়া জীবনের স্কুলে মানুষ যা শেখে, যা দেখে, সেই শিক্ষার সঙ্গে তো স্কুলের শিক্ষার কোনো মিল নেই। আসলে এই বয়সেই ওর আত্মসম্মান জিনিসটা গড়ে উঠেছে, যা অনেক বুড়ো-বুড়ো লোকের মধ্যেও দেখি না।

তার নিজের ছেলে সম্বন্ধে (নিজেরই ছেলে?) পরের মুখে জ্ঞান শুনতে ভালো লাগছিল না সবুজের।

পথে নেমে সবুজ বলল, চললাম। আপনি তাহলে আসছেন না?

ফণী খুব অপরাধীর মত হাসল।

বলল, কিছু মনে করবেন না। আমার বড় খারাপ লাগছে। উপায় থাকলে নিশ্চয়ই যেতাম। তারপর সবুজের হাত ধরে ফণী

বলল, আপনি মানুষটি বড় ভালো সবুজবাবু। বড় উদার আপনি। আপনার মত উদার লোক দেখিনি আমি।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমি কি বোঝাতে চাইছি।

সবুজ মাথা নাড়ল।

তারপর থলে হাতে রোদে হেঁটে বাড়ির দিকে আসতে আসতে বিড়বিড় করে বলল, তা আর বুঝিনি! বিলক্ষণ বুঝেছি। তোমার মত রতনকে আমি না চিনলে আর কে চিনবে?

রোদে ঘেমে, তেতে, হাঁটতে হাঁটতে ফণীর উপর একটা তীব্র ঘৃণায় সবুজের শরীর বেঁকে গেল। সবুজ মনে মনে কামনা করল, ফণীকে ঐ ছোঁড়াগুলো ভাল করে ধোলাই দিক একদিন। যাকে বলে আড়ং ধোলাই। ফণীর বাতেল্লা বন্ধ হয়ে যাবে। ঐ ফণীর জন্যেই আজ বহু বছর সবুজ যেন একটা লাশ-কাটা ঘরের নিস্পন্দ উষ্ণতাহীন মৃতদেহের সঙ্গে এক ঘরে এক খাটে জীবন কাটাচ্ছে। সবুজ বেঁচে থেকেও মরে রয়েছে।

৮

হাজারীবাগ রোড স্টেশনে যখন শেষরাতের বোম্বে মেল থেকে নামল ওরা, তখনও বেশ রাত আছে। ঠাণ্ডাও আছে ভালো। পুজোর আর একমাসও দেরি নেই। এদিকে বেশ মিষ্টি ঠাণ্ডা পড়ে গেছে।

মালপত্র সব নামানো হলে, কুমুদ বলল, কি সবুজবাবু, একটু চা-টার বন্দোবস্ত করুন। জমে গেলাম যে।

তারপর বলল, আপনি এগিয়ে গিয়ে চায়ের বন্দোবস্ত করুন, আমি মালপত্র সমেত যাচ্ছি। প্রধান মালটিকে আপনি সঙ্গে নিয়ে যান—বলেই, কমলার দিকে দেখাল।

কমলা ঝেঁঝে উঠল। বলল, স্ত্রী সম্বন্ধে এরকম রসিকতা আমার ভালো লাগে না।

কুমুদ অপরাধীর মত মুখ করে বলল, সরী!

সবুজ আর কমলা ওভারব্রিজটায় উঠছিল।

ওভারব্রিজের মাথায় উঠে কমলা বলল, কী শীত গো—বলেই সবুজের গায়ের কাছে ঘন হয়ে এল। সবুজের বাহুতে কমলার পাতলা স্কার্ফের নীচের ঋজু অথচ নরম বুকের ছোঁয়া লাগল এক মুহূর্তে। গা শিরশির করে উঠল সবুজের। এই শেষরাতের স্টেশনে আচমকা ভালো-লাগায় ভরে গেল ও।

ওভারব্রিজ থেকে নেমেই চায়ের দোকান। বাস দাঁড়িয়ে আছে পাশে। কনডাক্টর চেঁচাচ্ছে, বগোদর, বগোদর। হাজারীবাগ।

দেখতে দেখতে কুমুদ এসে গেল মালপত্রসমেত। মালটাল বাসে তুলে, সামনের দিকের সীটের উপর টুকিটাকি জিনিসপত্র

রেখে বাস থেকে নেমে এল।

বলল, কই? চা কোথায় সবুজবাবু?

সবুজ চায়ের ভাঁড় এগিয়ে দিল।

সবুজ আর কমলাও চা খাচ্ছিল। বেশ লাগছিল মিষ্টি মিষ্টি ঠাণ্ডায় ভোর রাতে দাঁড়িয়ে ভাঁড়ের সোঁদা সোঁদা গন্ধমাখা চা খেতে।

চা খাওয়া শেষ করে কুমুদ পানের বাটা বের করে গোটা চারেক পান একই সঙ্গে মুখে পুরে দিল। তারপর জর্দা খেল খানিকটা।

সবুজকে বলল, খাবেন নাকি একটা?

সবুজ বলল, দিন।

কমলা কুমুদকে বললে, কি যে ছাগলের মত পান খাও দিন-রাত বুঝি না।

কুমুদ কখনও কমলার কথার জবাব দেয় না। বিশেষ করে এমন কোনো কথার, যে কথার জবাব দিলে ঝগড়ার সূত্রপাত হতে পারে। বেশ লাগে সবুজের। কুমুদ জীবনে মিনিমাম এফার্টে কি করে সুখী হতে হয়, তা বেশ জেনে গেছে। সুখের বন্যা ওর জীবনে।

কিছুক্ষণ পর ওরা বাসে গিয়ে উঠল।

জানালা তুলে দিয়ে ওরা একটু ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা করল। শেষ রাতে ট্রেন থেকে নামার ঝামেলাটা পুষিয়ে নিতে চাইল।

জানালার পাশে কমলা, তার পাশে কুমুদ, কুমুদের পাশে সবুজ।

কুমুদ ভাবছিল, গিয়েই বাজারে যাবে, কি তরিতরকারি পাওয়া যায় আনবে, মুরগী কিনবে। বীয়ার পাওয়া গেলে বীয়ার। সবুজবাবুকে নিয়ে বেড়াতে আসার মানে নেই। বীয়ার খায় না, তাস চেনে না, এক অদ্ভুত চীজ্।

সবুজ ভাবছিল, কুমুদের কোনো সঙ্গী জুটে গেলে ভালো হয়,

ও আর কমলা একটু একা থাকার, একা বেড়াবার সুযোগ পাবে। কুমুদটা আচ্ছা লোক—এত খরচখরচা করে কোলকাতার বাইরে এসে সারাদিন দরজা বন্ধ করে বীয়ার খাবে, সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার করে জুয়া খেলবে তিনপাত্তি—এরা কেন যে কোলকাতার বাইরে আদৌ আসে তা বোঝে না সবুজ।

পবক্ষণেই ভাবে, ভাগ্যিস কুমুদ এসেছিল, নইলে ওরও কি আসা হতো? হাজারীবাগের নাম শুনেছে কত, কিন্তু আসা হয়নি কখনও। এই ক'টা দিন তার মস্ত বড় প্রাপ্তি। একঘেয়ে, ক্লান্তি আর ক্লান্তি; ভীষণ ক্লান্তির জীবনে এ এক বিশেষ প্রাপ্তি। যেমন ফণীবও। ফণীর জন্যেও ও ময়দান ফাঁকা রেখে এসেছে। হাসি যদি জানতেও পারে যে, সবুজ অফিসের কাজে আসেনি, তাহলেও দুঃখিত হওয়ার কোনোই কারণ নেই তার।

দেখতে দেখতে সারিয়া থেকে বগোদরে এসে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক বোড পেরিয়ে বাসটা হু-হু কবে এগিয়ে চলল।

বাইবে ভোর ভোর হয়েছে। পুবের আকাশে হালকা সোনালী আভা দেখা যাচ্ছে। দু'পাশে বেশ জঙ্গল আরম্ভ হয়েছে এখন।

কুমুদ নাক ডাকাতে আরম্ভ করেছে বসে বসে। কমলার চোখ বোজা। মাথা জানালার শার্সির উপরে নোয়ানো। ঘুমোচ্ছে কি না বুঝতে পারছে না সবুজ।

কুমুদকে দেখে বেশ হিংসা হয় সবুজের। খুব সুখী কুমুদ। ওর সুখে কোনো ঘোরপ্যাঁচ, কম্প্লিকেশান্ কিছুই নেই। সুখী হতে হলে কুমুদের মত সহজ সরল হতে হয়। পৃথিবীর সকলকে বিশ্বাস করতে হয়। স্ত্রীর প্রেমিককেও।

টাটিঝারিয়ায় এসে পণ্ডিতের দোকানে চা, নিম্‌কি ও কালোজাম খেলো ওরা।

কুমুদ বলল, সবুজবাবু, আরো দুটো মিষ্টি নিন। দারুণ

করেছে।

চা-টা সবুজের বেশী ভালো লাগল।

হাজারীবাগে এসে যখন ওরা পৌঁছল, তখন বেশ বেলা। আসলে হাজারীবাগ শহর অবধি ওরা গেল না। কোররার মোড়ে বাস থেকে নেমে পড়ে তিনটে সাইকেল রিকশা নিয়ে ক্যানারী পাহাড়ের দিকে চলল।

সামনের রিকশায় কুমুদ আর কমলা। সামাজিক শীলমোহর-মারা স্বামী-স্ত্রী। দিনের আলোয়, বাইরের লোকের সামনে এমনি করেই চলতে হয় সব স্বামী স্ত্রীকে। সবুজ-হাসিকে, কমলা-কুমুদকে। হাসি পায় সবুজের। অথচ এটাই নিয়ম। 'নিয়মটাকে চ্যালেঞ্জ না করে মেনে নেওয়াটাই খুশী হওয়ার সোজা রাস্তা।

প্রায় সোজা রাস্তাতেই চলেছে সাইকেল রিকশাগুলো। শেষেরটায় সবুজ।

ক্যাঁচোর-ক্যাঁচোর করে চলেছে, অসমান লাল মাটির পাথুরে রাস্তায়। ডানদিকে খোওয়াই ; জলপাওয়া সবুজ শালবন, ঘন হয়ে মিশেছে ক্যানারী পাহাড়ের পায়ে। তারপর পাহাড়কে অতিক্রম করে চলে গেছে। ছড়িয়ে গেছে চারদিকে। ঘন, চাপ চাপ গাঢ় সবুজের সমারোহে।

মাথার উপর দিয়ে একদল বক দুলতে দুলতে উড়ে গেল। কিরকম এক উদ্ভটস্বরে ডাকতে ডাকতে।

চারিদিকে চাইতে চাইতে সবুজ চলেছে। বর্ষাশেষের মিষ্টি হাওয়া লাগছে গায়ে। ভারী ভালো লাগছে সবুজের।

সামনের রিকশা থেকে কমলা মুখ ফিরিয়ে বলল, কী দারুণ জায়গাটা, না ?

সবুজ বলল, দারুণ।

কুমুদ বলল, আর কি ? খাওয়া-দাওয়া আর ঘুম। আমি কিন্তু রিল্যাক্স্ করতে এসেছি। বাড়ি থেকে বেরুচ্ছি না।

সবুজ প্রথমে অবাক হলো। তারপর খুশী হলো। ভাবল, আশ্চর্য! কত রকমের মানুষ হয়। প্রত্যেক লোকের সঙ্গে প্রত্যেকের কত তফাত। ভাগ্যিস তফাত ছিল, নইলে সবুজের মধ্যে কমলা ভালো-লাগার মত কিছুই দেখতে পেতো না, যদি তার যা কিছু ভালো-লাগার সবই পেয়ে যেত কুমুদের মধ্যে। তারপরই হাসির কথা মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে যেতেই ও কিছুতেই ফণীকে আর হাসিকে ক্ষমা করতে পারল না। ওদের সম্পর্কটা ক্ষমারও অযোগ্য। কি করে হাসি সবুজকে পেরিয়ে ফণীর দিকে হাত বাড়াল? ফণীর জন্যে সবুজকে নস্যাৎ করে দিল?

এমন সময় একটা শাদা মোটরগাড়ি সবুজের রিকশার পাশ কাটিয়ে লাল ধুলো উড়িয়ে চলে গেল। কিন্তু গাড়িটা কুমুদদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কুমুদ কি যেন বলে উঠল। গাড়িটা রিকশা থেকে অনেকখানি এগিয়ে গিয়ে জোরে ব্রেক কষে দাঁড়াল। চেক-চেক হাওয়াইন শার্ট পরা একজন মোটাসোটা বেঁটে খাটো ভদ্রলোক নামলেন—গায়ের রঙ কালো—মুখটা ভোঁতা—সবুজের সমবয়সী।

ভদ্রলোককে দেখে কুমুদ রিকশা থেকে নেমে গাড়ি অবধি হেঁটে গিয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে কি সব কথা বলল।

সবুজের সাইকেল রিকশাটার চেন খুলে গিয়েছিল, তাই সবুজ অনেক দূরে থাকতে থাকতেই কুমুদের সঙ্গে কি সব কথাবার্তা বলে ভদ্রলোক গাড়ি নিয়ে চলে গেলেন।

সবুজের রিকশা কাছে পৌঁছতেই কুমুদ অতি কষ্টে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, কে জানেন?

সবুজ শুধোল, কে?

—আরে, বিখ্যাত সাহিত্যিক মধুপ সেন। নাম শোনেননি?

সবুজ বলল, না।

—সে কি? কুমুদ অবাক গলায় বলল।

কমলা বলল, তুমি যেন কত লেখা পড়েছ, কত যেন সাহিত্যরসিক লোক!

কুমুদ স্বভাববিরুদ্ধভাবে কমলার প্রতিবাদ করে বলল, কেন? “ভালোবাসি” সিনেমা দেখিনি?

কমলা বলল, হ্যাঁ, ঐ বই ছবি হয়েছিল বলেই দেখেছ।

কুমুদ একটু চুপ করে রইল। তারপর বলল, আমরা যেখানে উঠছি তার পাশেই উনি আছেন। পুজো সংখ্যার উপন্যাস লিখতে এসেছেন।

সবুজ মুখে বলল, বাঃ।

মনে মনে বলল, জ্বালাবে।

তারপর বলল, মেয়েরা ছাড়া আর কেউ কি এসব সাহিত্য-ফাহিত্য পড়ে? ছেলেদের তো সময়ই নেই। কার সময় আছে অমন ঢাউস্ ঢাউস্ লেখা পড়বার?

কুমুদ বলল, তাও সুন্দরী মেয়েরা পড়ে না। তাদের সময় নেই। সব সময়ই তো হাত জোড়া, মন জোড়া—তাদের কত অ্যাডমায়ারার—এসব ফালতু লেখা পড়ার সময় কোথায় তাদের?

কমলা বলল, তাহলে পড়েটা কারা?

কুমুদ বলল, সেইটেই ভেবে পাই না!

সবুজ শুধোল, ভালো লেখেন?

কুমুদ বলল, তা কে জানে?

—তাহলে বললেন যে, বিখ্যাত সাহিত্যিক?

কুমুদ সবুজের নির্বুদ্ধিতায় ব্যথিত হয়ে বলল, আরে কত বড় বড় করে ওঁর নাম বেরোয় দেখেন না বিজ্ঞাপনে? “প্রচণ্ড সাহিত্যিকের একান্ত উপন্যাস।” তার মানেই, ভালো লেখেন। এ আবার লেখা পড়ে জানতে হবে নাকি? আপনি মশায় একেবারে……।

দূর থেকে বাড়িটা দেখা যাচ্ছিল।

কুমুদ চেঁচিয়ে বলল, ঐ যে দেখা যাচ্ছে।

কুমুদ বড় চেঁচায়। তবু সবুজ তাকিয়ে দেখল। দূর থেকেই প্রথম দর্শনে ভালো লেগে গেল বাড়িটা। অনেকখানি জায়গা নিয়ে কম্পাউণ্ড—বড় বড় ইউক্যালিপ্‌টাস্ গাছ, সোনাঝুরি গাছ, অনেকটা ঝাটি জঙ্গল, বাড়ির মধ্যেই বিরাট বিরাট কালো-রঙা বিভিন্নাকৃতি পাথর। বেশ বসে আড্ডা দেওয়া যাবে। ছোট্ট ছিমছাম বাংলোটি।

মধুপবাবু বোধহয় মালীকে বলে গিয়েছিলেন যাবার সময়।

মালী ঘরদোর খুলে রেখেছিল ইতিমধ্যেই। একবেলার রান্নাও নাকি তার বউ করে রেখেছে কোলকাতার মালিকের চিঠি পেয়ে।

সবুজ একেবারে কুয়োতলায় গিয়ে তেলটেল মেখে ভালো করে চান করল। যাওয়ার সময় কুমুদবাবুকে ডাকল। কুমুদবাবু বললেন, দূব মশাই, কোলকাতার ছেলে আমরা, কখনও অমন করে চান কবা অভ্যেস নেই। খালি গায়ে, খোলা জায়গায় দাঁড়ালে আমার গায়ে হাওয়া লাগলেই সুড়সুড়ি লাগে।

খাওয়াদাওয়ার পর সকলেই ‘একটু গড়িয়ে নিই’ বলে শুয়েছিল।

সবুজ এক ঘুম দিয়েই উঠে পড়েছিল। বিছানাতেই শুয়ে শুয়ে ওর ঘরেব জানালা দিয়ে বাইরে চেয়েছিল। প্রথম শরতের নীল আকাশ—। বিকেলের রোদ ইউক্যালিপ্‌টাসের পাতায় পিছলে যাচ্ছে। এই গাছগুলোর কাণ্ডগুলো মেয়েদের ফরসা উরুর মত। নিটোল, মসৃণ, দেখলেই গা শিরশির করে। হাওয়াতে মিষ্টি হালকা ঝাঁঝের গন্ধ উড়ছে। অসমান লাল জমি, পিটিস্ ঝোপ, খোওয়াই এসব পেরিয়ে দূরে দেখা যাচ্ছে পীচের রাস্তাটা। ঐ রাস্তাটা নাকি রাজডেরোয়া ন্যাশনাল পার্ক হয়ে, সোজা চলে গেছে বড়্‌হি—ঝুম্‌রী-তিলাইয়া।

হাতঘড়িতে সবুজ দেখল চারটে বাজে। মনটা একটু চা-চা

করছে। এমন সময় হাতে চায়ের কাপ নিয়ে কমলা এসে ঢুকল।

হাসিমুখে বলল, কি? সবুজের সমারোহতে সবুজ দিশেহারা নাকি?

সবুজ বিছানায় উঠে বসল। বালিশটাকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে বসে বলল, এসো, এসো। এক্ষুনি চায়ের কথাই ভাবছিলাম।

তারপরই সবুজ শুধোল, কুমুদ কোথায়?

কমলা বলল, কুমুদ মধুপবাবুর বাড়ি গেছে জায়গাটা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে।

কমলা এসে খাটের উপর ওর পায়ের দিকটায় বসল।

চান করে উঠে একটা ফিকে সবুজ-রঙা ভয়েল শাড়ি পরেছিল ও—সঙ্গে ম্যাচ করা ব্লাউজ। গলায় একটা নীল পাথরের হার, কানে তিব্বতী নীল পাথরের দুল।

কমলার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে, কমলার বানানো চায়ে চুমুক দিতে দিতে সবুজের মন কী এক দারুণ ভালো-লাগায় ভরে উঠল। ওর নিজের কোনো দুঃখ, কোনো হীনমন্যতার কথাই এ মুহূর্তে আর মনে রইল না। ওর নিজের কথা, ওর পারিপার্শ্বিকের সমস্ত কথা ভুলে গিয়ে ও অনিমেষে কমলার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

কমলা বলল, চলো, বারান্দায় গিয়ে বসি। কী সুন্দর না বারান্দাটা!

—হুঁ। সবুজ বলল।

বাড়ির লাগোয়া বাঁধানো বিরাট বারান্দা। বসার জায়গা করা আছে। ওরা দু'জনে গিয়ে বসল মুখোমুখি।

ততক্ষণে রোদ পড়ে গেছে। নানারকম পাখির ডাক, তিতিরের ডাক ভেসে আসছে ঝাঁটি জঙ্গল থেকে। এক ঝাঁক টিয়া তাদের ট্যা ট্যাঁ আওয়াজে বুকের মধ্যে চমক তুলে ক্যানারী পাহাড়ের দিকে চলে গেল।

কমলা বলল, এই বারান্দা ব্যাপারটা আমার দারুণ লাগে। কোলকাতার বাড়িতে বারান্দা নেই—আমার খুব ইচ্ছে করে একটা বারান্দাওয়ালা বাড়িতে থাকতে।

তারপরই একটু চুপ করে থেকে বলল, তোমাদের বাড়িতে কি বারান্দা আছে? আমার মনে নেই, কতদিন আগে একবার গিয়েছিলাম। ভাবলে অবাক লাগে, না? হাসিই ছিল আমার বন্ধু, তার সূত্রেই তোমার সঙ্গে আলাপ, আর এখন হাসির খবরই রাখি না; হাসি সব জানলে কি মনে করত জানি না। কি রকম করে মানুষ একজনের কাছ থেকে সরে এসে, অন্যজনের কাছের হয়ে যায়। তাই না?

তরপর কমলা আবার শুধোল, বারান্দা নেই, না?

সবুজ মাথা নাড়ল। বলল, নেই।

কমলা হঠাৎ বলল, আমাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যেও একটা করে বারান্দার বড় দরকার। ঘর মানেই একঘেয়েমি—সমাজের, কর্তব্যের: দিন-গুজরানো, চলা-ফেরা সবই ঘরের মধ্যেই। মাঝে মাঝে ঘর ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াতে বড় ইচ্ছা করে—যেমন এই মুহূর্তে তুমি আর আমি বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছি। কিছুক্ষণ। কিছুক্ষণের ভালো-লাগা। তারপরেই যেই ভিতরের ডাক আসে, ঘরের মধ্যের ডাক, কর্তব্যের, অভ্যাসের, অমনি ঘরে ফিরে যেতে হয় আমাদের সকলকে। যেমন আমি যাব কুমুদের ঘরে, তুমি যাবে হাসির ঘরে।

সবুজ অবাক হয়ে শুনছিল।

কমলা একটু পরে বলল, জানো সবুজ, ঘরের মধ্যে পেতে পেতে, অনেকদিন থাকতে থাকতে, খুব দামী পাওয়াগুলোকেও বড় সস্তা বলে মনে হয়, মনে হয় এগুলোর বুঝি কিছুমাত্রও দাম নেই। বারান্দায় কিছুক্ষণ দাঁড়ালে, বাইরের হাওয়া, বাইরের জীবন, পাখির ডাক, লোকজন, এ-সবের ভালো-লাগায় মন ভরে ওঠে।

আশ্চর্য! বারান্দায় থেকে, বারান্দায় কিছুক্ষণ কাটিয়ে আবার ঘরে ফিরে গেলে ঘরের রোজকার টুকরো টুকরো, সস্তা মনে করা পাওয়াগুলোকে হঠাৎ এক নতুন চোখে আবিষ্কার করা যায়। তারা যে কতখানি দামী, তা বুঝি বুঝতে পারা যায়।

কমলা একসঙ্গে অনেক কথা বলে ফেলে চুপ করে রইল।

সবুজও চুপ করে দূরের পাহাড়েব দিকে চেয়েছিল।

হঠাৎ সবুজ বলল, কমলা, তুমি কাছে এলে ভালো-লাগায় মরে যাই কেন বলতে পারো? আমি যে তোমাকে ভালোবেসে আমার ঘর নষ্ট করলাম; আমার বিবাহিত জীবন একেবারে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল, আমি যে হাসির প্রতি আর কোনও আকর্ষণই অনুভব করি না—কেন? এর কি কোনো উপায় নেই? আমি তোমাকে পাওয়ার জন্যে সব কিছুই কবতে পারি। তুমি আমার জন্যে কি করতে পারো? তুমি আমার জন্যে কুমুদকে ছাড়তে পারো? পারো?

কমলার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল এক মুহূর্তের জন্যে।

ওব তীক্ষ্ণ নাক, খোলা চুলের ভার, ওর হালকা নীল শাড়ির নীলচে আভাসে মনে হলো, ও যেন অনেক দূরে চলে গেছে সবুজের কাছ থেকে।

কমলা হাসল। সবুজের মনে হলো, যেন অনেকক্ষণ পরে এবং অনেকক্ষণ ধরে ও হাসল। অদ্ভুত হাসি। সেরকম হাসি একমাত্র কোনো বুদ্ধিমতী মেয়ের পক্ষেই হাসা সম্ভব।

তারপর বলল, পারি না সবুজ। হয়তো চাইও না।

সবুজের গলায় অভিমানের সুর লাগল।

বলল, তোমার জন্যে আমি কিন্তু পারি। সব ছাড়তে পারি।

কমলা আবার হাসল। বলল, আমি জানি তা।

সবুজ অবাক হলো। বলল, তুমি জানো? জেনেও, আমি যা পারি তা তুমি পারো না? তা তো পারবেই না—আমি তো

তোমাকে কুমুদ যেমন করে রেখেছে, তেমন করে রাখতে পারব না। আমি তো অত সচ্ছল নই।

কমলা হাসল। বলল, তুমি বড় বোকা।

তারপরই কথা ঘুরিয়ে বলল, আচ্ছা! তোমার কি ধারণা, ঘর না ছাড়লে কাউকে ভালোবাসা যায় না? তোমার কাছে ভালোবাসা ব্যাপারটা এখনও বড ধোঁয়াটে আছে।

সবুজ অভিমানের গলায় বলল, তাই হয়তো কারো ভালোবাসা পেলাম না জীবনে।

কমলা খিলখিল করে হেসে উঠল।

বলল, পাগল! ভালোবাসা নিশ্চয়ই পেয়েছ তুমি—কিন্তু তুমি তা চিনতে পারনি। তুমি নিজেকে এত ভালোবাসো, সব সময়ে সে ভালোবাসা তোমাকে এমন করে ঘিরে থাকে যে, অন্যের ভালোবাসার দাম বোঝনি তুমি।

তারপর বলল, তুমি তো অনেক জানো সবুজ, তবু আমি সামান্য একজন ঘরের বউ হিসেবে তোমাকে একটা কথা বলছি, কথাটা মনে রেখো।

—কি? কি কথা?

ফুঁসে উঠে সবুজ শুধোল।

কমলা তখনও চোখ দিয়ে হাসছিল।

বলল, শোনো, আমার কাছ থেকে ভালোবাসার প্রথম পাঠ নাও। ভালোবাসা পাওয়ার প্রথম শর্ত হচ্ছে নিজেকে না-ভালোবাসা। অন্যকে, যাকে তুমি ভালোবাসো, তার সুখের মধ্যেই তোমার নিজের সুখকে দেখতে পাওয়া।

একটু চুপ করে থেকে কমলা আবার বলল, পারবে সবুজ? যদি পারো তো, ভালোবাসা পাবে, অনেক ভালোবাসা, অনেকের ভালোবাসা। যে ভালোবাসা পেতে জানে, দিতে জানে, সে নিজের ঘরে এবং মাঝে-মধ্যে এই এক চিল্‌তে বারান্দায় দাঁড়িয়েই

তা নিতে ও দিতে জানে, ভালোবাসা খুঁজতে তাকে দেশান্তরী হতে হয় না। ঘর ছাড়তে হয় না। দেশান্তরী হলেও, প্রতি বছর তোমার মত করে নতুন কাউকে ভালোবেসে নতুন-নতুন ঘর বাঁধলেও, তুমি দেখতে পাবে যে, সে-ঘরে তোমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। দোষটা ঘরের নয়, তোমার ভালাবাসার জনেরও নয়; দোষটা তোমার; তোমার নিজের।

শেষের কথাগুলো একটু কঠিন করে বলল কমলা।

সবুজ দুঃখিত হলো।

সবুজ কি একটা বলতে যাচ্ছিল জবাবে, কিন্তু তার আগেই কমলা বলল, তোমার এই তুমি-ময় জগৎ ছেড়ে বাইরে আসতে হবে। নিজের কথা একটুও না ভেবে অন্যকে বিনা-দ্বিধায় ভালোবাসতে শিখতে হবে—নইলে তুমি কখনও সুখী হবে না সবুজ। আমি তো একজন সামান্য কমলা। পৃথিবীর সব মেয়ে ও পুরুষ তোমাকে একসঙ্গে ভালোবাসলেও তোমাকে সুখী করতে পারবে না।)

সবুজ এবার একই সঙ্গে অনেক কথা বলতে যেতেই, গেটের কাছে কুমুদকে দেখা গেল।

কুমুদ আসছে। তার পিছনে পাহাড়-প্রমাণ বোঝা নিয়ে একজন কুলী।

কমলা শুধোল, এ কি! মোটে ঘণ্টাখানেক হলো তো গেলে, এরই মধ্যে চলে এলে? বাজার কতদূর?

কুমুদ পান খাচ্ছিল। দিবানিদ্রা দিয়ে চোখমুখ ফোলা, চুলগুলো এলোমেলো, পাঞ্জাবির বুকে খানিকটা পানের পিক্ গড়িয়ে পড়েছে।

জর্দার ঢোক গিলে কুমুদ বলল, আরে, বুদ্ধি খরচ করতে হলো। মধুপবাবুর গাড়ি নিয়ে গিয়েছিলাম। উনি বললেন, যখন খুশি গাড়ি নিয়ে যাবেন, আমি তো সারাদিনই ব্যস্ত আছি এখন,

বেরুবার সময় হয় না—সন্ধ্যের পর আড্ডা মারি—চলে আসবেন।

তারপর কুমুদ বলল, ব্যস্, আর কি? ওঁর গাড়িতে, ওঁর ড্রাইভারকে ধরে বোঁ করে বাজার ঘুরে এলাম।

কমলা বলল, তুমি বেশ হ্যাংলা আছ। পরের গাড়ি চেয়ে নিয়ে বড়লোকী করার দরকার কি?

কুমুদ হাসল। বলল, আরে বড়লোকী তো মনের ব্যাপার, সে কি আর গাড়িতে হয়। আমার মত বড়লোক কে? আমার কমলা আছে। ওদের কি আছে? আর কার কমলা আছে?

কমলা আড়চোখে একবার সবুজের দিকে তাকাল।

কুমুদ আবার বলল, দ্যাখো, দ্যাখো, কি দারুণ পেয়ারা এনেছি। তুমি পেয়ারা খেতে ভালোবাসো—মুরগী এনেছি—আলু, পেঁয়াজ, ডিম, ইসাব্গুলও; মাছ পাওয়া গেল না—কাল ভোরে চলে যাব রাঁচী রোডে, জলের ট্যাঙ্কের কাছে নাকি টাটকা মাছ আসে।

তারপরেই, সবুজের দিকে ফিরে বলল, কি মশাই? মুখ গোমড়া কেন? গিন্নীর কথা মনে পড়েছে বুঝি? তা নিয়ে এলেই তো পারতেন বাবা। আমি তো মশাই গিন্নী-ছাড়া শুতেই পারি না। ঘুমই আসে না। পাশটা খালি-খালি লাগে।

কমলার মুখে এক চিল্তে রক্ত এলো।

কমলা বলল, থাক, বুড়ো বয়সে আর ঢং করতে হবে না।

সবুজের মনে হলো, কথাটা ঢং নয়। ঢং হলে কমলা লজ্জা পেত না অমন করে।

সবুজ ভীষণ অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। ও বুঝতে পারল না, স্বামী-স্ত্রীতে এতই যদি প্রেম, তাহলে ওকে জোর করে এমন করে নিয়ে আসার মানে কি? তখন তো কত ন্যাকামিই করল কমলা, তুমি না গেলে যাব না, যেতেই হবে—এইসব।

আনাজ-পত্র বাজার সব ভিতরে নিয়ে গেল মালী। সঙ্গে কমলাও গেল।

কুমুদ বলল, নিন, একটা পান খান। ভালো জর্দা আছে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও সবুজ পানটা হাতে নিল। মুখে পুরল। তারপর বলল, আমি একটু হেঁটে আসছি।

কুমুদ বলল, আবার হাঁটাহাঁটি কেন ? বেশ তো আছেন মশায় ; সূর্যটা ডুবে যাক। আমি আছি আর সঙ্গে একটা রামের বোতল আছে। বারান্দায় জমিয়ে বসব, মধুপবাবুও আসবেন। উনি অবশ্য খান-টান না। ব্যাক্-ডেটেড সাহিত্যিক। তবে সংস্কার-ফংস্কার নেই। রামের সঙ্গে সঙ্গে একটু সাহিত্য-ফাহিত্য আলোচনা হবে—। কোলকাতায় ফিরে, বুঝলেন কি না, অনেকদিন পর্যন্ত একটা ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল নেশায় বুঁদ হয়ে থাকব।

সবুজ মনে মনে বলল, ইডিয়ট।

মুখে বলল, আমি সাহিত্য-ফাহিত্য বুঝি না। কোনো ইন্টারেস্ট নেই সাহিত্য অথবা সাহিত্যিক সম্বন্ধে।

কুমুদবাবু অবাক হয়ে বললেন, সে কি মশাই ! বুঝি না তো আমিও, তা বলে ইন্টারেস্ট থাকবে না কেন ? না থাকলেও, দেখাতে হবে। আরে বাঙালীর ছেলে হয়ে জন্মেছেন, তিনটে নিয়ম মেনে চলবেন সব সময়।

বলেই, মুখে আর একটু জর্দা ফেলে বললেন, পয়লা নম্বর—বউকে ভয় পাবেন। আসলে ভয় না পেলেও, দেখাবেন যে ভয় পাচ্ছেন ; তারপর বাইরে যা-করার তা করে বেড়াবেন।

তারপর একটু থেমে, বলবেন কি বলবেন না ভেবে নিয়ে বললেন, আমি তো মশাই নিয়মিত এদিক-ওদিক, বুঝলেন কি না—।

তারপরই গলার স্বর নামিয়ে বললেন, দেখবেন, বলে দেবেন না যেন। বললে কিন্তু যা কৃষ্ণলীলা আপনিও চালিয়ে যাচ্ছেন আমার স্ত্রীর সঙ্গে, তা বন্ধ করে দেবো। বুঝলেন মশায়, আপনি চলেন ডালে ডালে, আমি চলি পাতায় পাতায়। আমি সবই জানি।

তবে, আমার বিশেষ আপত্তি-ফাপত্তি নেই। চালিয়ে যান। আমি বাইরে ঘুরেই সুখ পাই, বুঝলেন না, "ঘরকা মুর্গী ডাল বরাব্বর"। ঘরে আমার মন বসে না। ঘরের লোককে আপনি যদি একটু-আধটু আনন্দ দিতে পারেন তো দিন। তবে লোক আপনি ডেঞ্জারাস নন। আপনার এলেম আমার জানা হয়ে গেছে। আপনার মত মেয়েছেলে-মার্কা ব্যাটাছেলে সাহিত্য পড়েন না এটাই আশ্চর্যের কথা। যাক্গে, আমার কোনো ক্ষতি নেই। তবে, ঘুণাক্ষরে এ-কথা কমলা যেন না জানে। মানে, আমি যে আপনার কেলোর-কীর্তি জানি, সেই কথাটা। আমি যে কথা বললাম আমার সম্বন্ধে, তাও যেন না জানে।

শেষেব কথাটা রীতিমত ভয় দেখিয়েই যেন বলল কুমুদ।

সবুজের ঐখানে কুমুদের সঙ্গে আর একটুও বসে থাকতে ইচ্ছে করল না। কী এক অপমানে, লজ্জায়, জ্বালায় তার কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। কমলার প্রতি এক তীব্র সমবেদনায় ওর মন হু-হু কবে উঠল।

সবুজ বলল, আমি একটু হেঁটে আসি, বুঝলেন কুমুদবাবু!

কুমুদ অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবছিল।

—অত হাঁটার বাতিক কেন? ডায়াবেটিস্ আছে নাকি?

তারপর সবুজের কাছ থেকে উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলল, যান।

আসন্ন-সন্ধ্যায় এই বন-পাহাড়ের পটভূমিতে শেষ বিকেলের হালকা নরম রোদে ক্যানারী হিল রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে সবুজের মনে হলো, ও হাঁটছে না, ও যেন দৌড়চ্ছে। ওর মনে হলো ও এখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে যেতে পারলে সুখী হতো।

এই মুহূর্তে, কমলার জন্যে ওর বড় দুঃখ হলো। কমলার পরম সৌন্দর্যময় ঐশ্বর্যময় অন্তরের মধ্যে ওর স্বামী সম্বন্ধে ওর যে চাপা গর্বটুকু ছিল, যে গর্বে ভর করে ও সহজে এতদিন সবুজকে প্রত্যাখ্যান

করেছিল, বলেছিল "কুমুদ আমাকে ভালোবাসে, কুমুদ জানলে দুঃখ পাবে", সেই গর্বটুকু যে চোরাবালির উপর দাঁড়িয়ে আছে, তা কমলা জানে না। আন্তরিক ভালোবাসার এই কি প্রতিদান? এমন করে কি কেউ কাউকে ঠকায়?

ভাবতে ভাবতে সবুজের মাথা গরম হয়ে উঠল। ও বুঝতে পারছিল না যে, কি করে একজন মানুষ এতখানি ভণ্ডামি, এতখানি অভিনয় নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে? অবশ্য এ কথা সত্যি যে, ঐ ভণ্ডামির মূল্যে কুমুদ ঘর এবং বাইরে সমান কৃতী। তার ভালোবাসার ঘর, কমলার স্নেহ-মমতা, ভালোবাসা, সবই সে পায়, উপরিও পায় বাইরের সস্তা জগতের কাছ থেকে। যেখানে কড়ি ফেলে কেউ কেউ ফুলেল তেল মাখে।

সবুজ ভাবছিল, ও নিজে কি কখনও এতখানি ভণ্ডামি করতে পারত? মানুষ মিথ্যাচার করলে, ভণ্ডামি করলে কি নিজের কাছেই বড় ছোট হয়ে যায় না? ভিতরে ভিতরে কি সে ক্ষয়ে যায় না? সমস্ত অন্তরের সরল সত্য আন্তরিকতায় এ-জীবনে যা পাওয়া যায় অথবা যা পাওয়া যায় না, তার সব কিছুরই একটা বিশেষ দাম আছে বলে সবুজ মনে করে। যে কারণে, ফণীকে হাসি ভালোবাসে, এ-কথা জানার পর থেকেই হাসির সম্পর্কে কখনও ও সহজ হতে পারেনি। আন্তরিকভাবে হাসিকে ভালোবাসতে পারেনি, কাছে টানতে পারেনি। কাছে টানতে না পেরে দুঃখ পেয়েছে নিশ্চয়ই, ফণীর কাছে হেরে গিয়ে পরাজয়ের গ্লানিও স্বীকার করেছে সত্যি। কিন্তু তবুও তো ওর নিজের মধ্যে, কমলার সঙ্গে ওর সম্পর্কের মধ্যে, ওর সত্য অনুভূতিতে ও বেঁচে আছে। এটা তো সত্যি। ও নিজের মধ্যে তো এমন করে মিথ্যা, ঠগ প্রবঞ্চক হয়ে যায়নি। এর কি কোনোই দাম নেই? জীবনে সুখী হতে গেলে কি ঠগই হতে হয়, অভিনয় করতেই হয়? বিনা-অভিনয়ে কি কোনো কিছুই পাওয়া যায় না এখানে?

অন্ধকার হয়ে আসছিল। পথের পাশের পিটিসের ঝোপ-ঝাড়ে ছাতারে পাখিরা কেমন নড়েচড়ে বসছিল। একটা ছোট পেঁচা পাহাড়তলীর জঙ্গলে কিঁচর্ কিঁচর্ কিঁচর্—কিঁচি কিঁচি কিঁচর্ করে ডেকে ফিরছিল।

সবুজ সেই অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকারতর জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওর বুকের মধ্যের অন্ধকারের ভার বোঝার চেষ্টা করছিল।

ও ভাবত, কমলা অন্তত সুখী। কমলার সুখেও এত কাঁটা? আহা বেচারী, জানতে পারলে, কি জানি না করবে—হয়তো আত্মহত্যাই করে বসবে।

একটু পরে বেশ অন্ধকার হয়ে এলো চারপাশ। তাড়াতাড়িতে টর্চ নিয়ে বেরোয়নি ও। পথ ভালো দেখা যাচ্ছিল না। সবুজ আবার তাদের বাড়ির দিকে ফিরল।

কমলা চান করে নিয়েছিল। চান করে পরিষ্কার হয়ে বাইরের বারান্দায় গিয়ে বসেছিল। সমস্ত অন্ধকার বারান্দা ওর সুস্নাত গায়ের গন্ধে, নানারকম ফুলের গন্ধে, ইউক্যালিপটাস্ পাতার গন্ধে ভরে ছিল।

সবুজ বারান্দায় উঠে ওর উল্টোদিকে বসল।

অন্ধকারই ভালো। অন্ধকারে কমলা সবুজের মুখ দেখতে পাবে না। সবুজের মুখ দেখলে চমকে উঠবে কমলা। ভয় পেয়ে যাবে হয়তো।

কমলা নিজেই বলল, কুমুদ গেল মধুপবাবুর কাছে। বলল, আজকে আমিই যাই। কালকে ওঁকে নেমন্তন্ন করব ভাবছি।

—ও! সবুজ বলল।

তারপর সবুজ হঠাৎ বলল, কালই ফিরে গেলে হয় না? আমার এখানে ভালো লাগছে না।

কমলা হাসল। বলল, জানি, তুমি আমার উপর রেগে গেছ,

আমি তোমার সঙ্গে হাঁটতে যাইনি বলে। কিন্তু গেলে কুমুদ কি মনে করত? ও তো তখনও বাড়ি ছিল। তুমি বড় অবুঝ। তুমি কিছু বোঝো না।

—একটু কম বোঝাই ভালো। সবুজ বলল।

—তাছাড়া, তুমি যাবার সময় আমাকে একবার ডাক দিতেও তো পারতে। কমলা বলল।

সবুজ মনে মনে বলল, আমার ডাক কি তুমি শুনতে পাও? তোমাকে তো সব সময়ই ডাকি কমলা! তুমি কি তা বুঝতে পারো?

কমলা বলল, চল! তোমার ঘরে চল।

—কেন? সবুজ বলল।

—আহা! চলই না।

তারপর, যেন অনেক দূরের থেকে বলল, আমার কী-ই বা দেওয়ার মত আছে তোমাকে। তবু, যেটুকু আছে, তার সমস্তটুকুই তোমাকে দেবো আজ। তোমার অনেকদিনের বাসনা আজ পুরাবো। তুমিই কিন্তু ঠকবে। আমি তো নতুন কিছু দিতে পারব না তোমাকে। হাসি যা দেয়, তার চেয়ে বেশী বা দামী তো আমার কিছু নেই। তবু, কেন যে তুমি এমন কাঙালপনা করো, জানি না। যাক্‌গে, তুমি যদি সুখী হও আমাকে পেয়ে, তাতেই আমার সুখ।

সবুজের কান্না পেল।

সবুজের সমস্ত মন বলতে চাইল, তোমাকে আমি ভালোবাসি কমলা—। কিন্তু তোমার জন্যে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। যে প্রবঞ্চনার মধ্যে তুমি জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কাটাচ্ছ, তাতে তোমাকে আমার করুণা করতে ইচ্ছা হয়। বিশ্বাস করো, আজ তোমার কাছে আমার কিছুমাত্র চাইবার নেই। বরং তোমাকে যদি আমি কিছু দিতে পারি, তোমার এই মিথ্যা, ফাঁপা সুখে যদি কোনো সত্যিকারের সুখের আনন্দ জাগাতে পারি, তাহলেই

আমার অনেক পাওয়া হলো বলে জানব আমি।

কিন্তু সবুজ চুপ করেই রইল। কিছুই বলতে পারল না।

কমলা উঠল। বলল, তুমি এখনও বুঝি রাগ করে আছ ?

বলেই, অন্ধকার বারান্দায় সবুজের কাছে উঠে এসে বাচ্চাদের যেমন করে আদর করে, তেমন করে হঠাৎ সবুজকে জড়িয়ে ধরে গালে আদর করল সে।

কমলার গরম নিশ্বাস সবুজের মুখে লাগল, বুকে লাগল।

কমলা জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছিল।

কমলা অস্ফুটে বলল, চলো, ভিতরে চলো।

সবুজের ঘরে ঢুকে, কমলা নিজের হাতে শিকল তুলে দিল। বাতিটাও নিবিয়ে দিল।

সবুজ শুধোল, কুমুদ ?

কমলা বলল, ও রাত ন'টার আগে ফিরবে না।

তারপরেই বলল, এখন ওর কথা বোলো না।

বাগানের আলোটা ম্যাগনোলিয়া গ্ল্যাণ্ডিফোরা গাছটার পাতার ভিতর দিয়ে চুইয়ে বিছানায় এসে পড়েছিল। দূরে পাহাড়ের নীচে টি-টি পাখি ডেকে বেড়াচ্ছিল।—চম্‌কে-চম্‌কে, বুকের মধ্যে চমক তুলে। আর ঝিঁঝির স্বর—একটানা—চাপা—ঝিম্‌-ধরা ঝিঁঝির স্বর। সমস্ত চেতনার মধ্যে কী এক গভীর স্বর বেজে যাচ্ছিল ; একটানা।

কমলা যে এত সুন্দর, সবুজের ধারণা ছিল না।

অন্ধকারের ওম-ধরা নীড়ে একটি নরম-লাজুক-পাখিকে সবুজ আদর করছিল। বেড়ালে-ধরা সাদা কবুতরের মত ছটফট করছিল কমলা। কত সব আশ্চর্য, অস্ফুট, গা-শিউরানো আওয়াজ করছিল মুখে।

সবুজ কমলার নরম অথচ ঋজু শরীরের সঙ্গে মিশে গিয়ে বিড়বিড় করে বলল, তোমারও ওষুধ আছে কুমুদ।

বলল, ফণী, তোকে এতদিনে হারালাম আমি। হারামজাদা!

কমলা চাপা গোঙানির স্বরে শুধোল, কি বলছ ?

সবুজ বলল, কথা বোলো না—এখন কথা বোলো না।

খুব ভোরে উঠে সবুজ আর কমলা হাঁটতে বেরিয়েছিল।

সবুজ যখন বাথরুমে, তখনও বাথরুমের জানালা দিয়ে শুকতারাটা দেখা যাচ্ছিল। নানা রকম পাখির কিচির-মিচির। বাথরুমের সামনে ঝোপের কাছে ছাতারে পাখিদের ডানার ফর্‌র্‌-ফর্‌র্‌ শব্দ। ওদের গলার কর্কশ আওয়াজে সেই সকালের শান্ত,' অতীন্দ্রিয়, স্তব্ধ স্নিগ্ধতার আমেজটা যেন পেঁজা হয়ে যাচ্ছিল ছাতারেগুলোর ওপর খুব রাগ হচ্ছিল সবুজের।

কুমুদ রাত করে ফিরেছিল কালকে। ন'টা নয়, প্রায় রাত এগারোটার সময়।

যখন ফেরে, তখন সবুজ কুমুদের মুখে একটা উৎকট গন্ধ পেয়েছিল। সবুজ বুঝেছিল, কুমুদ একটা নতুন কোনো জিনিস খেয়েছে—মহুয়া-ফহুয়া হবে—যে গন্ধের সঙ্গে ও পরিচিত নয়। হারাধনের মুখ থেকেও গন্ধ পায় সবুজ মাঝে-মাঝে। এ-সব না খেলেও গন্ধ-টন্ধ চেনে ও। হারাধন ঠাট্টা করে বলে, দাদা আমার গন্ধ-গোকুল।

তারপর খেতে বসে বিশেষ কথা-টথা বলেনি কুমুদ কারো সঙ্গে। মাঝে-মাঝে একটা সুর ভাঁজছিল, "কা করে ম্যায় ছঁওড়া-পুতানীয়া, হাম হ্যায় এক দুখিয়া"।

কমলা বিরক্তির গলায় বলেছিল, এ আবার কোন্ ছিরির গান!

কুমুদ খেতে খেতে বাঁ হাত নেড়ে বলেছিল—এখানকার গান। এস-ও-এস-এর গান।

সবুজ শুধিয়েছিল, এস-ও-এস মানে?

কুমুদ জড়িয়ে জড়িয়ে বলেছিল, সন্‌স্‌ অফ্‌ দ্যা সয়েল।

সবুজেরও বিরক্তি লাগছিল। ভাবছিল, অতবড় সাহিত্যিক কি মহুয়া ছাড়া অন্য কিছু খাওয়াতে পারল না কুমুদকে? আজকাল এই মদ খাওয়া আর মাতলামি করা যে কী এক ফ্যাশান হয়েছে—তা ভাবা যায় না।

সবুজ হাঁটতে হাঁটতে শুধোল, কাল রাতে কুমুদবাবুর শরীর-টরীর খারাপ হয়নি তো?

কমলা বলল, না। দিব্যি মোষের মত ঘুমোল ভোঁস-ভোঁস করে।

তারপরই সবুজের দিকে চেয়ে, কুমুদের পক্ষ টেনে বলল, মানুষটা বড় সরল। একেবারে ছেলেমানুষ। মাঝে-মধ্যে মদ খাওয়া ছাড়া ওর অন্য কোনো দোষ নেই। থাকলেও বা আমার কি করার ছিল? ও যে আমাকে সত্যিই খুব ভালোবাসে—আমার প্রতি ওর সিনসিয়ারিটিটা পুরোপুরি খাঁটি। (যদি কেউ কাউকে সত্যিকারের ভালোবাসে, ভালোবেসে থাকে, তবে শুধুমাত্র সেই ভালোবাসার গুণের জন্যেই যে সে-ভালোবাসা পায়, তার উচিত হলো, যে তাকে ভালোবাসে, তার সব দোষ ক্ষমা করে দেওয়া।)

তারপর বলল, জানো সবুজ, জীবনে সত্যিকারের ভালোবাসার কাছে অন্য সমস্ত কিছুই তুচ্ছ। নিক্তির একদিকে ভালোবাসা বসাও, আর অন্যদিকে আর সবকিছু। দেখবে ভালোবাসার দিকটা সব সময়ই ভারী।

সবুজ চুপ করে ছিল।

এই সকালে, এই সুন্দর শারদ সকালে, শিশিরের গন্ধে, শিশিরে ভিজে থাকা গাছপালা, লতাপাতা, লাল মাটি, সবকিছুর গন্ধ তার নেশার মত লাগছিল। কমলার জীবনের প্রচণ্ড বঞ্চনাকে সে

এই সকালে বাইরে আনতে পারে না। যে-কমলা ভালোবাসাকে আঁকড়ে ধরে এত আনন্দে আছে, যার ভালোবাসাটা মিথ্যা হলেও যার কাছে আনন্দের তীব্রতাটা সত্যি, তাকে পথের ধুলোয় বসাতে পারে না ও। কনলা নিজেকে রানী মনে করে যদি সুখী হয় তো হোক না, সে যে ভিখারিণী এ-কথা তাকে জানানোর দরকারই বা কি?

একটা বাচ্চা ছেলে কতকগুলো মোষ নিয়ে পাহাড়ের দিকে চলেছে। মোষগুলোর গলার কাঠের ঘণ্টা থেকে গম্ভীর ডুগ্‌ডুগানি আওয়াজ উঠছে। এই পরিবেশে শব্দটা বড় আশ্চর্য রকম মানিয়ে গেছে।

হাঁটতে হাঁটতে সবুজ ভাবছিল, কোলকাতার এত কাছে যে এত সুন্দর জায়গা আছে, ও কখনও ভাবতে পারেনি। কমলার অনাবৃত শরীরের মধ্যে, সবুজের হাতের কাছেই যে এত সৌন্দর্য ছিল, এত গভীর আনন্দের উৎস ছিল, তাও সবুজ কখনও ভাবতে পারেনি। কাল রাতের পর সবুজ যেন কত অন্যরকম হয়ে গেছে। ও অনেক উদার হয়ে গেছে। কাউকে অনেক অনেকদিন ধরে অন্তরে শরীরে কামনা করে তাকে পাওয়ার যে আনন্দ, সে আনন্দের বুঝি কোনো তুলনা নেই। আজ সবুজ জেনেছে, সে আনন্দের মানে কি, তার মানে কতখানি! পানা-পড়া পুকুরের মত তার জীবনে, তার গলির বদ্ধতায়, তার গলির ছোট মাপে, তার অফিসের পদমর্যাদার সামান্যতায় সে এতদিন বড়ই ছোট মাপের হয়েছিল। রাতারাতি সে তার সমস্ত হীনমন্যতা কাটিয়ে এমনই এক বড়-মাপের মানুষ হয়ে উঠেছে যে, ওর ভয় হচ্ছে যে কোলকাতায় ফিরে গিয়ে ও বুঝি নিজের জীবনের ফ্রেমে আর আঁটবে না, ঐ জীবন তাকে কুলিয়ে উঠতে পারবে না।

হঠাৎ সবুজ বলল, আচ্ছা, কুমুদের বন্ধুর এই হাজারীবাগের বাড়িটা আমি যদি দিন দুইয়ের জন্যে চাই, পাবো?

কমলা অবাক হয়ে সবুজের দিকে তাকাল। বলল, কার সঙ্গে এসে থাকবে? আমাকে বুঝি সঙ্গে নেবে না?

সবুজ হাসল। বলল, সিরিয়াস্‌লি জিজ্ঞেস করছি।

কমলাও হেসে বলল, কেন পাবে না? এ বাড়িটা কুমুদের বন্ধুর নয়। ও তো কোম্পানীর পারচেজ ডিপার্টমেণ্টের বড়বাবু —সাপ্লায়াররা তাই খাতির-টাতির করে। এ-বাড়িটা একজন সাপ্লায়ারের।

তারপর আবার বলল, কেন চাইছ বলো না?

সবুজ বলবে কি না ভাবল। তারপরই সবুজের মনে হলো কাল রাতের পর থেকেই পৃথিবীর তাবৎ লোকের তাবৎ অপরাধ ও ক্ষমা করে দিয়েছে, ক্ষমা করে দেবে বলে ও মনস্থ করেছে, এমন কি নিজের বুকের মধ্যেও যে সমস্ত অপরাধ জমা ছিল, হাসির প্রতি, ফণীর প্রতি, খোকার প্রতি, যে-সমস্ত অপরাধ আজ অবধি করেছে ও, তার জন্যেও সবুজ নিজেকে ক্ষমা করে দিয়েছে। পুরোনো হীন ক্ষুদ্রতার খোলস ছেড়ে ও এখন এক নতুন চকচকে সাপের শরীরের মত নিজের মনকে চেকনাই দিয়েছে।

—বলো না গো? কমলা আবার মেয়েলি কৌতূহলে শুধোল।

সবুজ হাসল। বলল, জানো, আমার যেমন তুমি আছ, হাসিরও তেমনি একজন বন্ধু আছে।

কমলা খুব খুশী হয়ে উঠল। ওর চোখ দুটো ভালো-লাগায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বলল, সত্যি? আছে বুঝি? কই, আমাকে কখনও বলোনি তো আগে? কী ভালো যে লাগছে না শুনে!

সবুজও হাসছিল।

সবুজ হাসতে হাসতে বলল, আছে। ভাবছি, হাসিকে আর তাকে টিকিট কেটে দিয়ে এ-বাড়িতে দু'দিনের জন্যে পাঠাব। আমরা যেমন আনন্দে আছি, ওরাও তেমনি আনন্দে থাকবে।

তারপর বলল, দারুণ হবে, না ?

—দারুণ হবে। কমলা বলল।

তারপর বলল, আহা! হাসিটা বড ভালো মেয়ে। ও আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু ছিল। খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে। কিন্তু বড় চাপা। তবে ও মোটেই যাকে-তাকে ভালোবাসার মত মেয়ে নয়। ওর মধ্যে চিরদিনই এমন একটা কিছু ছিল যা ওকে সব সময় আমাদের মত দশটা সাধারণ মেয়েদেব থেকে আলাদা করে রাখত। ওকে পুরোপুরি কখনও বুঝে উঠতে পারিনি আমি। শুধু আমি কেন, ওর কোনো বন্ধুই পারেনি।

কমলা বলল, যাকগে সেসব কথা, কিন্তু ভাবতেই ভালো লাগছে। ভালো লাগছে জেনে যে, হাসির জীবনেও একফালি বারান্দা আছে।

তারপরই হঠাৎ বলল, তুমি বুঝি এ-ব্যাপারটা ভালো চোখে দেখ না ? কি সবুজ ?

সবুজ বলল, আমি নিজেকে বুঝি না। কোনোদিনই বুঝিনি। আমি কি করি, কেন করি, কিছুই বুঝে উঠতে পারি না।

কমলা বলল, ছিঃ। এটাকে তুমি খারাপ ভাবো যদি, তাহলে তো তোমার আমাব সম্পর্কটাও খারাপ। আসলে তা নিশ্চয়ই নয়। দ্যাখো সবুজ, আমার মনে এখন দুটো ঘর আছে। একটা তোমার। একটা কুমুদের। কুমুদের চাবিতে তোমার ঘরের তালা কখনও খুলবে না, যেমন তোমার চাবিতে খুলবে না কুমুদের ঘরের। আমি আমাকে দু' টুকরো করে তোমাদের দিয়েছি। না, তাও বলব না, বলব, কুমুদকে সব কিছু দেওয়ার পর অথবা অন্যভাবে বললে, কুমুদের কাছ থেকে সব কিছু পাওয়ার পর আমার হাতে অনেক ছিল, এবং আমার মধ্যে তখনও অনেক শূন্যতা ছিল। আমি তাই তোমার মধ্যে উপচে গেছি। কিন্তু এ-কথা আমার মত করে আর কেউ জানে না যে, যখন আমি

কুমুদের, তখন আমার সমস্ত আমিই কুমুদের। আবার যখন তোমার, তখনও তাই-ই। (মেয়েরা অনেক কিছু পারে, যা ছেলেরা পারে না।) তোমাদের মধ্যে জমিদারী মনোবৃত্তিটা এখনও বড় প্রবল। তোমবা যাকে চাও তার সমস্তটুকু, অন্য সবাইকেই বঞ্চিত করে চাও; তাকে পাইক-বরকন্দাজ দিয়ে বেঁধে রাখতে চাও মনের থামে। কিন্তু তা কি হয় নাকি? মন বড় তরল জিনিস। তাকে কখনও বেঁধে রাখা যায় না, তাকে যত্ন করে দু'হাতের তেলোর মধ্যে ধরে রাখতে হয় সর্বক্ষণ। হাত একটু-খানি কেঁপে গেলেই, এদিক-ওদিক হলেই মন গড়িয়ে যায় অন্যমনে। তারপব একটু চুপ করে থেকে বলল, বুঝেছ? বোকা পুরুষ মানুষ?

সবুজ উত্তর দিল না। চুপ করেই থাকল।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা ক্যানারী হিলের বাংলোর কাছ অবধি এলো। পথে একটা হরিণ দেখল, ছোট জাতের পাটকিলে-রঙা হরিণ দৌড়ে ওদের সামনে দিয়ে রাস্তা পেরুল। বনমুরগী আর তিতির ডাকছিল জঙ্গলের ভিতর থেকে।

ফেরার সময় রোদ উঠে গিয়েছিল। কষ্ট হচ্ছিল না। ভোরের রোদে বরং ভালো লাগছিল।

সবুজ একগোছা জংলী ফুল পাড়বার জন্যে দাঁড়িয়েছিল। কমলা সবুজকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছিল। সবুজ বড় বড় পা ফেলে সামনের দিকে এগোল।

কমলাকে দেখা যাচ্ছে পিছন থেকে। এই কমলার কিছুমাত্র অদেখা নেই আর সবুজের, অজানা নেই। স্বাদু শরীরের সব খাঁজ, সব ভাজ দেখেছে সবুজ। জেনেছে তার নিজের শরীরের শিহরণের মধ্যে। আজ সকালের পরিপূর্ণ পোশাকের কমলাকে দূর থেকে দেখে তাই খুব ভালো লাগছিল সবুজের। কাল রাতের পর ওদের সম্পর্কটা অনেক গাঢ় হয়ে গেছে। কমলার যে কিছুই

অদেয় নেই সবুজকে, তার ভালোবাসার স্বীকৃতি দিতে যে তার কোনো কুণ্ঠা নেই, এ-কথা জেনে বারবার কমলার প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠছে ওর।

বাড়ির কাছাকাছি এসে গেল ওরা।

কমলা বলল, এখন কি খাবে? লুচি করব? না পরোটা?

সবুজ বলল, যা খুশি। তুমি যা খাওয়াবে তাই-ই খাবো।

—বাঃ বাঃ। মুখ ফিরিয়ে কমলা বলল।

কুমুদ বাড়ির কম্পাউণ্ডের ভিতরে রাতে-পরা পায়জামা আর পাঞ্জাবি পরে পায়চারি করছিল।

ওদের আসতে দেখে বলল, গুড মর্নিং। কতদূর বেড়িয়ে এলে?

কমলা বলল, অনেক দূর।

তারপর কুমুদকে শুধোল, চা খেয়েছ?

—এক কাপ খেয়েছি। তবে এখন বারান্দায় সকলে মিলে রোদে বসে আর এক কাপ করে খেলে মন্দ হয় না।

কমলা বলল, এক্ষুনি আনতে বলছি।

তারপর বলল, পরোটা খাবে তো তুমি?

কুমুদ বলল, অন্নপূর্ণা যা দেবে তাই খাবো।

কমলা হাসল। তারপর ভিতরে চলে গেল।

কুমুদকে দেখামাত্র ওর প্রতি একটা তীব্র ঘৃণা বোধ করল সবুজ। কিন্তু কুমুদের ঘাড়ে চড়েই ও এসেছে। কুমুদও নিশ্চয়ই ওকে সিন্দ্‌বাদ নাবিক ছাড়া আর কিছুই ভাবে না।

সবুজ এসে বারান্দার চেয়ারে বসল। কুমুদও পিছু পিছু এলো।

সবুজ বলল, কাল অত রাত করে ফিরলেন কেন? মধুপবাবু না এখানে লেখার জন্যে এসেছেন? সারা রাত ধরে এইসব করলে লেখেন কখন উনি?

—তিনিই জানেন।

উদাসীন গলায় কুমুদ বলল।

তারপর এদিক-ওদিক দেখে গলা নামিয়ে বলল, রাত করে কেন ফিরলাম, তা আপনি জানেন না? আপনাকে সুযোগ দিলাম। আপনার নিজের দ্বারা কিছু হতো না যে, তা আমি জানতাম। তবে কমলা নিশ্চয়ই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে। কি বলেন? সন্ধ্যেটা ভালোই কেটেছিল আপনার। কি মশাই? কাটেনি?

লোকটাকে যতই দেখছে, ততই অবাক হয়ে যাচ্ছে সবুজ।

সবুজ চুপ করে রইল।

কুমুদ বলল, শী ইজ ভেরী গুড ইন্ বেড। আপনার ভালো লেগেছে নিশ্চয়ই।

সবুজ মুখ ঘুরিয়ে রইল। একজন স্বামী তার স্ত্রী সম্বন্ধে অন্য একজনের কাছে কি করে এমন কথা বলে তাই ভাবছিল। ভাবছিল, লোকটা অদ্ভুত। এমন কোনো লোকের কথা ও শোনেও নি আগে কখনও।

আরেক কাপ করে চা, তারপর আবার পরোটা, ওমলেট ও আলুর তরকারি খাওয়ার পর কমলা বলল, আমি চানটা করে নিই।

কুমুদ বলল, চলুন সবুজবাবু, সাহিত্যিকের বাড়ি থেকে একটু ঘুরে আসি। গাড়িটা পাওয়া গেলে বাজারেও যাওয়া যাবে।

সবুজ বলল, আজকে কিন্তু আমি বাজার করব।

কুমুদ বলল, বেশ তো। অত উত্তেজনার কি আছে? করবেন।

কিছুক্ষণ পর মালীর কাছ থেকে থলি চেয়ে নিয়ে ওরা দু'জনে বেরিয়ে পড়ল। বেরোবার আগে কুমুদ গোটা চারেক পান আর জর্দা মুখে পুরে নিল।

ওদের বাড়ি ছেড়ে পর পর পথের দু'পাশে অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর বাড়ি। সবুজ প্রতি বাড়ির সামনে এসেই ওর চলার

গতি কমাতে লাগল, ভাবল এইটেই বুঝি মধুপবাবুর বাড়ি হবে, মানে যেখানে উনি উঠেছেন।

কিন্তু একে একে ওরা ক্যানারী হিল রোডের প্রায় শেষ প্রান্তে চলে এলো, পুলিশ-সুপারের বাড়িটাও ছাড়িয়ে এলো, কিন্তু মধুপবাবুর বাড়ি তখনও এলো না।

এমন সময় একটা রিকশা এলো ওপাশ থেকে—খালি রিকশা।

কুমুদ রিকশা দাঁড় করিয়ে তাতে উঠে বসল। বলল, উঠে আসুন মশায়।

তারপরই বলল, আচ্ছা, সতীনের অপোজিট জেণ্ডার কি? জানেন?

সবুজের কান গরম হয়ে উঠল।

বলল, জানি না।

কুমুদ পানের পিক গিলে বলল, সতীনের সঙ্গে সতীনের যা সম্পর্ক শুনেছি, আমার সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা কিন্তু সেরকম নয়। বেশ কর্ডিয়াল। কি বলুন?

সবুজ সে-কথা এড়িয়ে গিয়ে কুমুদকে শুধোল, মধুপবাবুর বাড়ি গেলেন না?

কুমুদ অবাক হওয়ার চোখে তাকাল সবুজের দিকে।

বলল, কে মধুপবাবু?

সবুজ আশ্চর্য হয়ে বলল, তার মানে? সাহিত্যিক মধুপবাবু, যার বাড়ি কাল রাত এগারোটা অবধি থেকে এলেন। এখনও কি নেশা কাটেনি আপনার?

—ও! কুমুদ বলল।

তারপরেই হেসে উঠল। বলল, ও হোঃ। তারপর হোঃ হোঃ করে হাসতে লাগল।

সবুজ বিরক্ত হয়ে বলল, ব্যাপারটা কি?

—ব্যাপারটা! বলে, আবার ঢোঁক গিলে কুমুদ বলল, মধুপবাবু

নেই। মানে আছেন হয়তো, তবে এখানে নেই। তাঁকে আমি চিনি না।

সবুজ আকাশ থেকে পড়ল। বলল, সে কি? তাঁর সঙ্গে আপনি কথা বললেন যে কোবরাব মোড় থেকে আসবার সময়! বললেন না? প্রথম দিন।

কুমুদ বলল, তা বললাম।

—তবে বলছেন যে আপনি চেনেনই না?

—সত্যিই চিনি না। উনি মধুপবাবু নন।

সবুজ চোখ বড় বড় করে শুধোল, তবে উনি কে?

—কে জানে? ঠোঁট উল্টে কুমুদ বলল।

তারপর বলল, পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, আমি বললাম, ভালো তো?

ভদ্রলোক ভাবলেন নিশ্চয়ই চেনা লোক, তাই গাড়ি থামালেন। আমি অমনি এগিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে বললাম, আরে, একদম ভুল হয়ে গেছে, আমার এক চেনা-ভদ্রলোক অবিকল আপনার মত··।

ভদ্রলোক স্মার্টলি বললেন, তা হবে। ভদ্রলোক তো ভদ্রলোকেব মতই দেখতে হবে। ভুল হতেই পারে।

তারপর আবার শুধোলাম, ক্যানারী হিল রোডের বাড়িগুলো কতদূর?

উনি বললেন, বেশি দূর নয়। এগিয়ে যান। দেখবেন নাম লেখা আছে।

তারপর আমি হ্যাণ্ডশেক্ কবার মত হাতটা বাড়িয়ে দিলাম। আর হাত বাড়ালে কোন্-না ভদ্রলোক উত্তরে হাত বাড়ান? তিনিও হাত বাড়ালেন। হ্যাণ্ডশেক্ হয়ে গেল।

উনি চলে গেলেন, আমি ফিরে এলাম। কমলা কিছু বুঝতে পারেনি। আপনার রিকশার চেন টাইম্‌লি ছিঁড়ে গেল। তারপরই মধুপবাবু।

সবুজের মনে হলো, সে কোনো গোয়েন্দা কাহিনী শুনছে।

পরক্ষণেই বলল, কিন্তু কেন? এই মিথ্যা কথা কেন? কিসের জন্যে?

কুমুদ তার বাঁ-হাতের পাঁচখানা আঙুল সবুজের চোখের সামনে নেড়ে বলল, থামুন মশায়। সব জিনিসেরই কারণ থাকে।

তারপর একটু চুপ করে থেকে কুমুদ বলল, আপনি জার্মান জেনারেল রোমেলের নাম শুনেছেন?

—হ্যাঁ। বোকার মত সবুজ বলল।

—জানেন, রোমেল শত্রুপক্ষকে বোকা বানাবার জন্যে কত কিছু করতেন? ট্রাকগুলোকে মরুভূমির মধ্যে চক্কর খাইয়ে বালি ওড়াতেন—যাতে শত্রুপক্ষ তার আসল শক্তি, আসল মতলব বুঝতে না পারে। এও সেরকমই কিছু একটা। ধোঁকা দেওয়া, বোকা বানানো। আপনি তো এমনিতেই বোকা, কমলাকে বোকা বানাবার জন্যেই এটা করতে হলো।

তারপর একটু চুপ করে থেকে কুমুদ বলল, ব্যাপারটা কি জানেন? আমি এদিক-ওদিক যাই আর যাই-ই করি, কমলা আমার বউ। আমি কমলাকে ভালোবাসি। ভীষণ ভালোবাসি। আপনার মত রোম্যান্টিক ভালোবাসা নয়। আমি ওর শরীরকে ভালোবাসি। ভালোবাসি কমলার শরীরের তুলনা নেই বলেই। আমি সবসময় তাকে পেতে চাই না। আমি ওকে নতুন করে রাখতে চাই। এদিক-ওদিক যাওয়াটা কমলাকে ভালোবাসারই একটা পেকাশ—বলেই বলল, সরি; প্রকাশ।

সবুজ চুপ করে রিকশায় বসেছিল।

রিকশাটা ততক্ষণে একটা বড় চৌমাথা পেরিয়ে কাছারীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল।

কুমুদ যেন নিজের মনেই বলে উঠল, কমলা আপনাকে ভালোবাসে। আমি জানি যে, ভালোবাসে। আপনার সঙ্গে থেকে,

বসে, শুয়ে ও যদি আনন্দিত হয়, তাহলে আমার কি? ও খুশি হলেই আমি খুশি। আপনিই বলুন? আমি যদি জলজ্যান্ত এই লাশ নিয়ে কাল সন্ধ্যায় বসে থাকতাম বাইরের বারান্দায়, তাহলে কি আপনারা দু'জনেই আমাকে কাঁটা মনে করতেন না? আমার আয়ুক্ষয় হয়ে যেতো। অনেক কষ্টে, অনেক ভালো-মন্দ খেয়ে এই লাশ বানিয়েছি মশায়, অত তাড়াতাড়ি মরতে চাই না। তার চেয়ে এই-ই ভালো হলো না কি? আমি কেয়ার-অফ মধুপবাবু হয়ে গেলাম। আমারও সম্মান বাঁচল, আপনারাও আমাকে আশীর্বাদ করলেন। এই দু'দিনের দুনিয়ায় মশাই, কি লাভ এর-তার পিছনে লেগে? নিজে আনন্দে থাকো, অন্যকে আনন্দে রাখো, এমনি আনন্দ চালাচালি করতে করতে একদিন হঠাৎ করে ফুটে যাও। এই-ই ভালো। আমি অন্তত এই-ই বুঝি।

তারপর বলল, আপনার কি মত?

সবুজের বাক্‌রোধ হয়ে গিয়েছিল। সবুজ কোনো কথা বলল না।

কুমুদ ওর কাঁধে থাপ্পড় দিয়ে বলল, এ কি মশাই, রাগ করার কথা তো আমারই। কিন্তু দেখছি আপনিই রাগ করে বসে আছেন আমার উপর। বেড়ে লোক তো?

সবুজ বলল, না, রাগ করিনি। ভাবছি।

কুমুদ বলল, এই বেশী ভেবে-ভেবেই তো বাঙালীদের কিছু হলো না। ভেবেই সারাদিন কাটাবে তো কাজ করবে কখন? আমি তো আগে যা করার, যাই-ই করার করে ফেলি, তারপর ভাবি। কবিদের মত অত গালে হাত দিয়ে ভাবা-টাবা আমার আসে না।

রিকশাটা বাজারের কাছে পৌঁছে গেল।

কুমুদ নেমে, রিকশা ভাড়া দিয়ে, থলে হাতে আবার পানের দোকানে দাঁড়াল, আবার চারটে পান খেলো জর্দা দিয়ে, তারপর পান-মুখে বলল, বাজার তো আপনি করবেন আজ, কি খাওয়াবেন

বলুন তো মিস্টার গ্রীন? আজ তো আপনার শয্যা-তুলুনীর খাওয়া। বলেই, হ্যাঃ হ্যাঃ করে হাসতে লাগল কুমুদ।

কয়েক ফোঁটা পানের পিক জর্দার পাতি সমেত সবুজের মুখে ছিটকে এসে লাগল।

সবুজের মুখ লজ্জায়, বিরক্তিতে লাল হয়ে উঠল।

কুমুদ বলল, ঐ দ্যাখো, আপনি আবার লজ্জা পাচ্ছেন দেখছি।

তারপর বাজারের ভিতরের দিকে যেতে যেতে বলল, তাহলে আপনারও লজ্জা বলে কিছু আছে। অবাক করলেন আপনি।

সামনে সামনে হেঁটে যাওয়া কুমুদকে ওয়াড়-পরানো তাকিয়ার মত দেখাচ্ছিল। তার পিছনে পিছনে হাঁটতে হাঁটতে এক প্রচণ্ড ধিক্কারে, নিজের উপর এক প্রচণ্ড বিদ্বেষে ওর মন ভরে উঠল। কেন যে ও কমলাকে ভালোবেসেছিল, কেন যে কাল কমলাকে পেয়েছিল, ও সেইসব কেন-র উত্তর হিসাবে নিজেকে মনে মনে লাথি মারছিল।

সবুজের চোখের সামনে হঠাৎ, একেবারে হঠাৎই বহু বহু বছর পরে হাসির মুখটা ভেসে উঠল। দৈনন্দিনতার গ্লানিমাখা, একটা ময়লা, সস্তা, খয়েরী-রঙা মিলের শাড়ি পরে হাসি জানালার গরাদ ধরে পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল। সবুজের প্রতীক্ষায়। তার চোখে আর কোনো চাওয়া ছিল না, ও শুধু চেয়েছিল যে, সবুজের ভালো হোক, সবুজের ডি-এ বাড়ুক, সবুজ সৎ থাকুক, তার নাম হোক কাজেকর্মে। আজ এত বছর পরে হঠাৎই সবুজের মনে পড়ল, হাসি তার নিজের জন্যে কোন কিছুই চায়নি সবুজের কাছ থেকে। এক কৌটো পাউডার নয়, একটা শাড়ি নয়, কোনো কিছুই নয়। যা চেয়েছিল হাসি, তা সবুজের ভালোবাসা। সবুজের প্রতীক্ষায় চিরদিন দাঁড়িয়েছিল, অন্ধকার গলির অন্ধকারতর ঘরের জানালার গরাদে। সবুজ কখন ফিরবে, সেই অপেক্ষায়।

সবুজের মনে হলো, বিদ্যুৎ-চমকের মত হঠাৎই মনে হলো যে,

একদিন সেই ঘর, সেই কলতলায় জল পড়ার শব্দ, সেই পাঁচিলের উপরে বসা পাতিকাকের গলার পরিচিত স্বর, সেই গলির মধ্যের বেলের খোসা, ভাঙা-চুড়ি, ছেঁড়া-চিঠি, গলির সেই ফেরিওয়ালার হাঁক, সেই সমস্ত পরিবেশকে, চেনা লোককে, হাসির বুকের গন্ধকে একদিন সবুজ ভালোবেসেছিল।

সবুজের চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করল, আমি কেন এলাম এই হাজারীবাগে? আমি কেন এলাম—এত আলো, এত প্রাণ, এত খুশি, এত কদর্যতার মধ্যে আমি কেন এলাম?

হঠাৎ ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল সবুজ।

সবুজ ভাবত, সে তার জীবনে সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করেছে ফণীকে। আজকে ওর মনে হলো, ফণীর জায়গায় ও কুমুদকে বসাবে। আর ফণীকে বসাবে ফণীর নিজস্ব মর্যাদার আসনে। কুমুদের পটভূমিতে ফণীকে ওব দেবতা বলে মনে হলো।

সবুজ ভাবল, কোলকাতা ফিরেই ফণীর কাছে ক্ষমা চাইবে ও। ফণীকে এনে তার পাশাপাশি জায়গা করে দেবে—তাদের ঘরে, তাদেব মনে। ফণীকে দেখাবে, বোঝাবে যে, সবুজও ভালোবাসার মানে বোঝে। হাসির কাছে প্রমাণ করবে যে, হাসি ওকে যা ভাবে, ও তা নয়।

ফণীর কাছে অনেক অন্যায় জমে গেছে, কোলকাতা ফিরেই ফণীর কাছে মাপ চাইবে সবুজ।

৯

হাওড়া ব্রীজের উপর দিয়ে ট্যাক্সিটা ছুটে যাচ্ছিল।

মাত্র তিনদিন কোলকাতায় ছিল না, কিন্তু সবুজের মনে হচ্ছিল, যেন কতদিন পর ও কোলকাতায় এলো। ব্রীজের উপর বাস, ট্রাম, ট্রাক, ট্যাক্সি, রিকশার ভীড়। যানবাহনের চলাচলে ব্রীজ থেকে ওঠা একটা চাপা গুমগুম প্রতিধ্বনি।

খুব ভালো লাগছিল সবুজের কোলকাতায় ফিরে। আসলে কোলকাতার এই আওয়াজ, চিৎকার, আবর্জনা, দুর্গন্ধ এরই মধ্যে কোথাও কিছুর সঙ্গে ওর নাড়ি বাঁধা আছে। ওর নাড়ি কাটা হয়েছিল একদিন চল্লিশ বছর আগে এই শহরেরই এক ঘরে। আবার একদিন এই শহরের বুকেই নরম পেলব পলিমাটি বয়ে আনা ঘোলারঙা ঘরোয়া নদীটির পারেই ও ছাই হয়ে যাবে। কোলকাতাকে ভালোবাসতে হলে বুঝি কোলকাতা ছেড়ে দূরে যেতে হয় কোথাও, যে জায়গা কোলকাতার চেয়ে অনেক সুন্দর। তারপর আবার পৃথিবীর এই বৃহত্তম বস্তিতে ফিরে আসতে হয়।

সবুজ ভাবল, কোলকাতা—কোলকাতা। কোলকাতার কোন বিকল্প নেই।

কুমুদরা এলগিন রোডের মোড়ে ওকে নামিয়ে দিল ট্যাক্সি থেকে।

কুমুদ সবুজের বাড়িতেই নামাতে চেয়েছিল, কমলাই আপত্তি করেছিল। বলেছিল, কি দরকার! তোমার অফিস আছে, তৈরী হয়ে বেরুতে বেরুতে দেরি হয়ে যাবে।

সবুজ বুঝল আসল কারণটা কি। হাসিকে মিথ্যে কথা বলে এসেছিল সবুজ। বলেছিল, অফিসের বন্ধুদের সঙ্গে যাচ্ছে দেওঘর।

কমলা তা জানত।

মালপত্র বলতে কিছুই ছিল না—একটা কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ ছাড়া।

ব্যাগটা কাঁধে ফেলে, একটা সিগারেট ধরিয়ে সবুজ নন্দন রোডে ঢুকে পড়ে, হরিশ মুখার্জী রোডে এসে পড়ল। তারপর হাঁটতে লাগল।

যে গলিতে সবুজ ঢুকল, সে গলিটাতেই ফণীর দোকান। ফণীর দোকানের সামনে দিয়েই ওকে যেতে হবে।

হাজারীবাগে ফণী সম্বন্ধে হঠাৎ বড় উদার হয়ে উঠেছিল সবুজ। এখন কোলকাতায় ফিরে মাথার মধ্যে সেই হাজারীবাগী মহত্ত্বটা আর নেই। নেই যে, এ কথা ভেবে আশ্বস্ত হলো সবুজ। ফণীটা যে একটা হাবামজাদা এ বিষয়ে সবুজের নিঃসংশয়তাটা আবার ফিরে এসেছে। খামোখা ও কেন ফণীকে মাথায় তুলে নাচবে? যে যেমন ব্যবহারের যোগ্য, তার সঙ্গে তেমন ব্যবহারই করা উচিত। হাজারীবাগে কমলার কাছে অনেক কিছু পেয়ে, ঐ চমৎকার ফাঁকা সুগন্ধি পরিবেশে তার মতিভ্রম হয়েছিল। এখন ও ডাস্টবিনের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। ও আবার ওর অভাব, ওর অভিমান, ওর অপ্রাপ্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে। “মেরেছ কলসীর কানা, তাই বলে কি প্রেম দেবো না”-তে বিশ্বাস করে না ও। ফণীকে ও যে-চোখে দেখে, সেই চোখেই দেখবে। হাসিকেও। হাসির ঘোমটার তলায় খেমটা নাচনকে ও কোনোদিনও ভালো চোখে দেখতে পারবে না।

সবুজের আবারও মনে হলো, তাহলে কমলা? কমলার সঙ্গে তার সম্পর্কটা?

ও নিজেকে বোঝাল, কমলা; কমলা। হাসি; হাসি। কার সঙ্গে কার তুলনা! কমলার সঙ্গে ওর ব্যাপারটা একটা আলাদা প্রেমের ব্যাপার, একটা পবিত্র ব্যাপার। এর মধ্যে দোষের কিছু

দেখে না সবুজ। দোষ আবার কিসের! দোষ মনে করলেই দোষ। এতে দোষের কি আছে?

তারপর সবুজ ভাবল, কমলা কত কি জানে, কি সুন্দর কথা বলে কমলা! কমলার কাছে গেলেই ও পুনরুজ্জীবিত হয়। ওর বেঁচে থাকার জন্যে কমলাকে ওর চাই। কমলা না থাকলে ওর জীবনের কোনোই মানে নেই।

সাহেবকে ও বলেই এসেছিল যে, সোমবার আসতে দেরি হবে।

সাহেব বলেছিলেন, ঠিক আছে। এলেই হলো।

সবুজ মনে মনে বলল, আজকালকার সাহেবদের এরকম হওয়াই ভালো। সেরকম কাজ আজকাল সরকারী অফিসে কেই বা করে? —আর যারা করে, তারাও কাজের জন্যে কাজ করে না—চাকরিটাকে টায়-টায় বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে করে—নিজের নিজের ফায়দার জন্যে করে। শুধুই কাজ করার জন্যে, দায়িত্ববোধের জন্যে, আজকাল কিছু বোকারা ছাড়া আর কেউই কাজ করে না।

হাঁটতে হাঁটতে হারাধনের কথা মনে হলো সবুজের। ভারী মজার মজার কথা বলে ছেলেটা—যতক্ষণ অফিসে থাকে, সবাইকে আমোদে রাখে—অফিসটাকে একটা জমজমাট আড্ডাখানা বানিয়ে রাখে। দেশে এখন হারাধনের মত ছেলেদেরই দরকার। প্র্যাকটিকাল, মূল্যবোধ-টুল্যবোধ এসব বাজে বুক্‌নী-ফুক্‌নী নেই। ও ঠিকই বলে, টাকা উড়ে বেড়াচ্ছে, শুধু ধরে নাও দাদা—খপাখপ ধরে নাও। এই কোলকাতার বুকে বসে তামাম ভারতবর্ষের লোক লাখ লাখ টাকা কামিয়ে নিচ্ছে, লাইফ এন্‌জয় করছে, আর বাঙালীরা সেই মান্ধাতার আমলের সব আইডিয়া আঁকড়ে ধরে মার খাচ্ছে সকলের কাছে। হারাধন বলে, আপনার প্রতিযোগীরা যেরকম হবে, আপনাকেও তো সেরকমই হতে হবে। নইলে তো হেরে যাবেনই আপনি। প্রতিযোগীরা খারাপ বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থেকে কিংবা না খেয়ে শুকনো টিকটিকির মত একদিন

ঝুপ করে লাইফ থেকে খসে যাবেন? সেটা তো হেরে যাওয়া।

না, না। সবুজ আর হারবে না। অনেকদিন বোকা থেকেছে, মার খেয়েছে, হার স্বীকার করেছে। আর নয়। এবার থেকে সবুজ শুধুই জিতবে, চালাক হবে, চতুর হবে; হারাধনের কাছা ধরে বৈতরণী পার হবে সবুজ।

ফণীর দোকানটার যত কাছাকাছি আসতে লাগল সবুজ, ততই ওর চোয়ালটা শক্ত হয়ে আসতে লাগল। ঈর্ষা, ঘৃণা সবকিছু মিলিয়ে তার বুকের মধ্যে একটা জ্বালা অনুভব করতে লাগল ও। ও ঠিক করল, ফণীর দোকানের সামনে দিয়ে ও হেঁটে যাবে, কিন্তু ফণীকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনবে না। ফণী যে আছে, ফণী যে তার জীবনে এমন জাজ্জ্বল্যমান শত্রুতার প্রতীক হয়ে আছে, সেই জানাটাকে ও অগ্রাহ্য করবে।

সবুজ ফণীব দোকানের সামনে এসে দেখল, দোকান বন্ধ; দোকানে তালা ঝুলছে।

আজ তো সোমবার। সোমবার তো দোকান বন্ধই থাকে। ভুলেই গিয়েছিল সবুজ। দোকানটা বন্ধ আছে বলেই, দোকানের সামনে দিয়ে মাথা উঁচু করে একটা সিগারেট ধরিয়ে সবুজ ধীরেসুস্থে হেঁটে গেল। ওর তাড়া ছিল না। ফণীকে ও হঠাৎ হারাবে না। তিলে তিলে হারাবে ওকে। সবুজ যেমন করে ওর নিজের অসহায়তাকে, হীনমন্যতাকে, অপারগতাকে ওর বুকের অন্ধকার সোঁদা ঠাণ্ডা ঘরে অনুভব করেছিল বহু বছর, তেমন করে অনুভব করাবে ফণীকে। ফণীকে সবুজ হ্যাণ্ডস্-ডাউন হারিয়ে দেবে। হাসির কাছ থেকে, খোকার কাছ থেকে, তার সংসারের কাছ থেকে আর কিছু চাওয়ার নেই সবুজের। ওর যা পাওয়ার, তা ও কমলার কাছ থেকে, বাইরের জগতের আনন্দের মধ্যে, নীল-রঙা একশো টাকার বিনিময়ে রোজ রোজ পাবে। চাইনীজ খাবার, বেড়ানো-টেড়ানো, ট্যাক্সি-চড়া, দামী সিগারেট খাওয়া, সিনেমা-

থিয়েটার দেখা—এসবের মধ্যেই, এসব নিয়েই সুখী থাকবে। তাছাড়া কমলা যা দিতে পারে, দিয়েছে সবুজকে, তেমন কিছু দেওয়ার কোনো ক্ষমতাই নেই হাসির। কমলা একাই একশো। কমলা তার জীবনে থাকলে হাসিকে আর ফণীকে সে তিল তিল করে টিপে টিপে মারবে।

সোমবার দোকান বন্ধ। তাহলে কি ফণী ওদের বাড়িতেই গেছে! এতক্ষণে কি ফণী তারই বিছানায়, তারই স্ত্রীর সঙ্গে মুখোমুখি বসে গল্প করছে ঘন হয়ে? আরো কিছু কি করছে? এই দিন-দুপুরে? হতেও পারে!

এবার তাড়াতাড়ি পা চালাল সবুজ। বাড়ির দিকে দ্রুত হাঁটতে লাগল।

বাইরের দরজাটা ভেজানো ছিল। ধাক্কা দিতেই খুলে গেল।

বাড়িতে ঢুকেই অবাক হলো সবুজ। বাড়িতে কি কেউ নেই? কোনো সাড়া নেই, শব্দ নেই, রান্নাঘর থেকে কোনোই আওয়াজ আসছে না—মনে হচ্ছে ভূতের বাড়ি।

বসবার ঘর পেরিয়ে বারান্দায় ঢুকতেই সবুজের রক্ত মাথায় চড়ে গেল।

বারান্দার এক কোণায় ফণীর টায়ার সোলের মলিন ধুলোমাখা চটিজোড়া উল্টে রয়েছে।

এই ফণীটা এই মুহূর্তে সবুজের তিনদিনের সযত্নে জমা-করা সব আনন্দ মাটি করে দিল। ওর সমস্ত জীবনটাই মাটি হয়ে গেল।

সবুজ ডাকল, রাম!

কেউ উত্তর দিল না।

সবুজ ডাকল, খোকা!

ডাকতেই, দুরন্ত ভেজা-হাওয়ার মত খোকা ওর ঘর থেকে দৌড়ে এলো—বাবা, বাবা—বলতে বলতে।

অনেক—অনেকদিন খোকার মুখে ও বাবা ডাক শোনেনি। খোকার ডাকের মধ্যে কি-যেন ছিল, মেঘলা দুপুরে ছাদের উপর একলা চড়ুই-এর ডাকের মত, সে-ডাক বড় ভয়-পাওয়া ডাক, বড় পরের উপর নির্ভর করার আকাঙ্ক্ষার ডাক।

খোকাকে যেন সবুজ চিনতে পারল না। খোকা যেন কিরকম হয়ে গেছে—ফ্যাকাশে, বিবর্ণ, উস্‌কোখুস্‌কো চুল।

খোকা দৌড়ে এসে সবুজের দুই উরু দু'হাতে জড়িয়ে ধরে জোরে কেঁদে উঠল। চিৎকার করে বলল, বাবা! ফণী মামা—!

খোকা আর কিছুই বলতে পারল না। ডুকরে কাঁদতে লাগল। ওর চোখের জলে সবুজের ধুতি ভিজে গেল উরুর কাছটায়।

এমন সময় খোকার ঘর থেকে রাম বেরিয়ে এলো।

রামও কাঁদছিল। অনেকক্ষণ থেকেই সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

সবুজ ভাবল, ফণীটার মধ্যে কী এমন ছিল যে, বাড়ির কাজ-করার লোকও এমনভাবে কাঁদে ওর জন্যে?

রাম ধরা গলায় বলল, ফণীবাবুকে খুন করেছে। ঈস্‌স্‌, কি রক্ত বাবু, কি রক্ত! খুন করেছে।

খোকার হাত দুটো সবুজের উরু থেকে আলগা হয়ে যাচ্ছিল। সবুজের মনে হলো, খোকা বোধহয় পড়ে যাবে মাটিতে, ও বোধহয় অজ্ঞান হয়ে যাবে।

সবুজ খোকাকে দু' হাতে জড়িয়ে বুকে তুলে নিল। তার আট বছরের রোগা জীর্ণ হাড়-বের-করা ছেলেকে।

খোকা সবুজের কাঁধে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। অস্ফুটে বলল, বাবা, বাবা, বাবা!

সবুজ দীর্ঘ ছ-সাত বছর পরে তার খোকাকে, তার শরীরের শরিক, তার রক্তজাত সন্তানকে কোলে তুলে নিল।

সবুজের জং-ধরা বুকের মধ্যে এমন এক বোধ বেজে উঠল, যা

ওর বুকে ছিল বলে ও কখনও জানেনি। এই প্রথম সবুজের মনে হলো, খোকার দিকে ও কোনোদিনও ভালো করে চেয়ে দেখার সময় পায়নি। নিজেকে নিয়েই বড় ব্যস্ত ছিল সবুজ। ওর মনে হলো খোকা ওকে ভয় পায় না, ওকে ঘৃণা করে না, ওকে ভালোবাসে। আজ তার দুঃখের দিনে ওর গলা জড়িয়ে তার ছোট্ট উপেক্ষিত খোকা বাবার কাছ থেকে সান্ত্বনা চায়।

কি হয়ে গেল, সবুজ জানে না, সবুজের চোখ দুটো জলে ভরে গেল। বাবা-মা মারা যাওয়ার পর সবুজ আজ বহু বছর পরে কেঁদে ফেলল, একটুও সংকোচ না করে, লজ্জা না করে। নিজেকে, ওর অত্যন্ত পরিচিত নিজেকে ওর নিজের কাছেই হঠাৎ সম্পূর্ণ অপরিচিত মনে হলো। এমন একজনের জন্যে ও হঠাৎ আজ কেঁদে ফেলল, যাকে সে চিরদিন কাঁদাতেই চেয়েছিল।

রাম বিড়বিড় করে কি সব বলছিল।

কিছু কথা কানে এলো, কিছু এলো না।

রাম বলছিল, ওরা সবাই একটু আগে শ্মশান থেকে ফিরেছে। ফণীকে পোড়াবার সময় ফণীর সেই বন্ধু, হাসি, রাম ও খোকা ছাড়া আর কেউই নাকি ছিল না। ফণীর আর কেউ ছিল না। খোকাই মুখে আগুন দিয়েছিল ফণীর।

সবুজ আত্মীয় ছিল না ফণীর। ফণীকে কখনও ওর আত্মার কাছে অনুভব করতে পারেনি ও। সবুজ কেউই হতো না ফণীর। সবুজের থাকার কথা ছিল না শ্মশানে। থাকেওনি।

ফণীটা তাকে বড় ঋণী রেখে হঠাৎ না বলে-কয়ে চলে গেল। বাকী জীবনের জন্যেও হারিয়ে দিয়ে গেল সবুজকে হারামজাদা।

সবুজ খোকাকে কোলে নিয়ে শোওয়ার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

খোকা সবুজকে এমনভাবে জড়িয়েছিল যে, সবুজের মনে হলো, ও কোনোদিনও ছাড়বে না ওর বাবাকে।

সবুজ মনে মনে বলল, আমাকে ছাড়িস না রে খোকা, চিরদিন আমাকে এমনি করেই জড়িয়ে থাকিস। আমার বুকেও তোর ফণীমামার মত অনেক ভালোবাসা ছিল রে, আছেও ; অনেক দরদ আছে। আমি কখনও দেখাতে পারিনি। আমার বাইরের শক্ত উদাসীন খোলের মধ্যের নরম, ভীষণ নরম মানুষটা কখনও বাইরে আসতে পায়নি। তোরা কেউ কখনও তা দেখাবার সুযোগও হয়তো দিসনি। তুই দেখিস, আজ থেকে তোর জন্যে, তোর মায়ের জন্যে, ঐ ফণীদার, ফণীমামার বুকে যত ভালোবাসা ছিল, তার সঙ্গে আমার বুকের সব ভালবাসা যোগ করে তোকে ভালোবাসব, তোদের ভালোবাসব। তুই দেখিস। আমাকে তোরা একটু সুযোগ দিস শুধু। তুই, তোর মা ; তোরা আমাকে একটু ভালোবাসতে দিস। আমি অন্য আরো দশজন ভালো বাবার মত, ভালো স্বামীর মতই কত ভালো হয়ে যাব। সত্যিই রে। তোরা দেখিস।

সবুজ শোওয়ার ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়েই স্তব্ধ হয়ে গেল।

হাসি চান করেছিল, কপালে বড় করে সিঁদুরের টিপ পরেছিল। ফণীর দেওয়া সেই শাড়িটা যত্ন করে পরে হাসি জানালার গরাদের সামনে দাঁড়িয়েছিল। পথের দিকে চেয়ে।

হাসির চোখে একটুও জল ছিল না, কিন্তু এক দারুণ জ্বালা ছিল। সবুজের চোখেমুখে যেন সেই আগুনের হল্‌কা লাগছিল।

হাসি গরাদ ছেড়ে, ওর দিকে মুখ করে দাঁড়াল। অনেকক্ষণ পূর্ণদৃষ্টিতে সবুজের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। অ—নেক ক্ষণ।

তারপর হঠাৎ মুখ নামিয়ে নিষ্কম্প নীচু গলায় বলল :

তুমি বড় দেরি করে এলে।